শাস্ত্রাপবাদ নিরাকরণ।

প্রথম ভাগ।

বেদব্যাস সম্পাদক

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা,

৬৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট্ "বেদব্যাস" যন্ত্রে

শ্রীবিনোদবিহারী মজুমদার দ্বারা

মুদ্রিত ও

শ্রীনৃসিংহদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১২৯৪ সাল।

উৎসর্গ।

সুহৃদবর

শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়

পরম প্রিয়জনেষু।

প্রিয়বর!

সাংসারীক জগতে তুমি আমার কল্যাণীয় হইলেও ধর্ম্মজগতে তুমি একান্ত পূজনীয়। তোমার প্রকৃতি, তোমার স্বধর্ম্মে ভক্তি ও শ্রদ্ধা, তোমার নিত্য অনুষ্ঠান, যিনি একবার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনিই তোমার পরম অনুরাগী হইয়াছেন। সুতরাং আমি যে তোমার একান্ত অনুরাগী হইব, বিচিত্র কি? তুমি ইহ-জগত ও ধর্ম্ম-জগত উভয় জগতেই আমার পরম সহায়ক ও সঙ্গি। তোমার ঋণ আমি কখন যে পরিশোধ করিতে পারিব এ আশা রাখি না। তবে যদি এই ক্ষুদ্র উপহার খানি তোমার সামান্য আনন্দের কারণ হয়, তাহাতে আমার পরম সুখানুভব হইবে, এই মাত্র আশায় তোমার পবিত্র হস্তে ইহাকে উৎসর্গ করিলাম। ইতি ১লা অগ্রহায়ণ—

তোমার চিরশুভানুধ্যায়ী

শ্রীভূধর দেবশর্ম্মা।

শাস্ত্রাপবাদ নিরাকরণ।

শাস্ত্রের দুরবস্থা।

হিন্দুর জ্ঞান চর্চ্চার জন্য শাস্ত্রই একমাত্র সম্বল। কারণ, শাস্ত্র ভিন্ন হিন্দু অন্য কিছুরই মান্য করিতে প্রস্তুত নহেন। রাজনীতি, ব্যবহারনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান, মুক্তি প্রভৃতি যাহাকিছুরই উল্লেখ করনা কেন এসমস্ত বিষয়েরই শিক্ষা-লাভে হিন্দুর মূল অবলম্বন একমাত্র সাধককুলদুরন্ধর ঈশ্বরপ্রতিম আর্য্যঋষি প্রণীত অভ্রান্তশাস্ত্রসমূহ। পরমদয়াল ঋষিগণ মানব জগতের অশেষ কল্যাণোপলক্ষে এই সমস্ত বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা অতি মূঢ় তাই এরূপ অমূল্যনিধি হাতে পাইয়াও পায়েঠেলিয়া ভস্মে নিঃক্ষেপ করিতেছি।

প্রকৃত শিক্ষা লাভে যাহা কিছুর প্রয়োজন তৎসমস্তই হিন্দুর ভাণ্ডারে সর্ব্বদাই প্রস্তুত; অথচ আমরা তাহা হইতে এরূপ বঞ্চিত কেন? এপ্রশ্নের একমাত্র

উত্তর প্রকৃত শিক্ষকের অভাব। যেরূপ শিক্ষক পাইলে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মোদ্ঘাটন হইতে পারে বর্ত্তমান সময়ে তাহার একবারেই অভাব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং শাস্ত্র থাকিলেও তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। শাস্ত্রই, কিরূপব্যক্তি কিরূপ-শিক্ষকের নিকট শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিলে শাস্ত্রার্থ বুঝিতে সক্ষম হইবেন, তাহাও পরিষ্কার করিয়া উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শাস্ত্রাধ্যায়ন করিতে যে যে উপকরণের আবশ্যক সময় প্রভাবে তৎসমুদয়েরই একরূপ ক্রমেই অভাব হইতেছে। প্রথম, সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা চাই, দ্বিতীয়, অধ্যাত্মজগতে প্রবেশের ক্ষমতা চাই, ৩য় সংসারাসক্তি বা বিষয় ভোগ তৃষ্ণা অত্যন্ত কম থাকা আবশ্যক, ৪র্থ, ঈশ্বর এবং আত্মার উপর নিতান্ত বিশ্বাস ও ভক্তি থাকা আবশ্যক, ৫ম, ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত একান্ত প্রবৃত্তি বা অনুরাগ থাকা চাই, এতদ্ব্যতীত আরও অনেকানেক গুণ থাকা আবশ্যক। এইরূপ করিলে তিনি শাস্ত্র অধ্যয়নের উপযুক্ত পাত্র হইলেন। কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে এই সমস্ত অর্জ্জন করা যায় তাহাও শাস্ত্রে অতি বিশদরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। তৎপর উপযুক্ত একজন গুরু থাকা আবশ্যক, যাঁহার নিকট এই মহাশাস্ত্র সমূ[illegible]য়ন করিতে হইবে। যিনি

বৈশেষিক ন্যায় ও সাঙ্খ্যাদি দর্শনশাস্ত্র এবং বেদান্ত (উপনিষৎ) শাস্ত্রাদিতে বিশেষ "অভিনিবেশ" সম্পন্ন, এবং সর্ব্বদা অধ্যাত্ম চিন্তাপরায়ণ, বিবেক, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, ভক্তি-শ্রদ্ধা সমন্বিত, নিরপেক্ষ, শৌচ, আচার ও উপাসনাদি তৎপর, এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ নিপুণ, ইত্যাদি গুণযুক্ত হইলে তাঁহাকে উপযুক্ত গুরু বলা যায়! ঈদৃশ গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিলেই শাস্ত্রের রহস্য বুঝা যাইতে পারে। এই সমুদায়ই শাস্ত্রাধ্যয়নের উপকরণ।

এখন বর্ত্তমান সমাজের অবস্থাও দেখুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে শাস্ত্রাধ্যয়নের প্রকৃত উপকরণ আছে কিনা। সমাজের মধ্যে কএকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যতীত আর কাহারই সংস্কৃত ভাষায় প্রকৃত অধিকার নাই ইহা বোধহয় সকলেই স্বীকার করিবেন। তৎপর অধ্যাত্মজগতে প্রবেশের অধিকার প্রভৃতি অন্যান্য গুণ বা উপকরণের বিষয় চিন্তা করিতেগেলে হৃদয় বড়ই বিহ্বল ও হতাশ্বাস হইয়া পড়ে। বিশেষ নব্য সমাজের অবস্থা আরও ভয়াবহ ও শোচনীয়। এ অবস্থায় যে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন ইহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব! সমাজের চিত্র [illegible] নব্য সমাজের অনেকগুলি লোকের অবস্থা ঠিক যেন চুণ গলির ফিরাঙ্গির অবস্থার ন্যায় হইয়া

পড়িয়াছে। চুণোগলির ফিরিঙ্গিরা পূর্ব্বে বিশুদ্ধ ম্লেচ্ছই ছিল, সুতরাং ম্লেচ্ছীয় প্রকৃতি এবং আচার ব্যবহারাদি তাহাদের পূর্ণ মাত্রায়ই ছিল, কিন্তু এখন বহুদিন যাবৎ এদেশে বসতি করা নিবন্ধন এদেশীয় লোকের সঙ্গে সংস্রব হইয়া ক্রমে অর্দ্ধ বাঙ্গালী ও অর্দ্ধ ম্লেচ্ছে পরিণত হইয়াছে। এখন উহারা ম্লেচ্ছীয় প্রকৃতি এবং ম্লেচ্ছীয় ভাবভঙ্গী ও আচার ব্যবহারাদি অনেকটা বিস্মৃতি হইয়াছে, আবার বাঙ্গালী হইতেও অনেক প্রকার প্রকৃতি, ভাব, ভঙ্গী ও আচার ব্যবহারাদি সংগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ অধিকার কোন দিকেই নাই। ইহাদের অন্তঃকরণ এখন দুপ্রকার স্বভাব বা প্রকৃতির দ্বারা সংগঠিত। সুতরাং ইউরোপীয় স্বভাব ও আচার ব্যবহারাদির মর্ম্মও উহারা সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, আবার বাঙ্গালীর স্বভাব এবং আচার ব্যবহারাদির মর্ম্মও সম্পূর্ণ হৃদয়স্থ করিতে সমর্থ হয় না। কারণ কোন ব্যক্তির স্বভাব হৃদয়স্থ করিতে হইলে ঠিক সেইরূপ স্বভাবাপন্ন হওয়া আবশ্যক, ক্রূর, খল, শঠ, হিংস্র এবং ভণ্ড পাষণ্ডের আন্তরিক প্রকৃতি বা স্বভাব কিরূপ তাহা, একজন পরম সাধু ব্যক্তি কোন রূপেই অনুভব করিতে পারিবেন না। তাঁহারা কেবল উহাদের বাহিরের কার্য্য প্রণালীই সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতে পারেন, কিন্তু অন্তঃ-

করণের কিরূপ অবস্থা হইয়া যে উহারা ঐ সকল কুক্রিয়াদি করে তাহা কিরূপে বুঝিবেন? আবার অত্যন্ত কুপ্রকৃতির লোকও সাধু ব্যক্তির হৃদয়স্থ ভাব বা প্রকৃতি বা স্বভাব অনুভব করিতে পারিবে না। আবার এক এক প্রকার আচার ব্যবহারের মর্ম্ম হৃদয়স্থ করিতে হইলেও সেই সেই আচার ব্যবহারবান্ হওয়া আবশ্যক, নচেৎ, তাহার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। মনে করুন, হিন্দুগণ শ্রাদ্ধ ও সন্ধ্যা বন্দনাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু এইটি ধান্ত্রিক কি ব্যাপার ইহার রহস্যই বা কি ইহা দ্বারা কি হয়, তাহা একজন ইউরোপীয়ান্ কোন প্রকারেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। কারণ, তাঁহার কোন পুরুষেও এইরূপ কোন আচরণ করে নাই। অতএব তিনি বাহির হইতে তিল, তণ্ডুল, ও কুশ কুসুমাদির ছড়াছড়ী দেখিয়া একটা পাগ্লাম ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই মনে করিতে পারিবেন না। রীতিমত ঐ সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেই উহার প্রকৃত মর্ম্মাদি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এইরূপে ইউরোপাদি দেশের অনেক আচার অনুষ্ঠান আছে যাহা আমরা সম্পূর্ণরূপ বুঝিতে পারি না। সুতরাং চুণোগলির ফিরিঙ্গিদের পূর্ব্বোক্ত অবস্থা ঘটিয়াছে।

আজ কাল নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকেরই

বাল্যকালাবধি বিদেশীয় শিক্ষা, বিদেশীয় সংসর্গ এবং প্রবলতর অনুচিকীর্ষা প্রভাবে ঐ ফিরিঙ্গির ন্যায়, না বাঙ্গালী, না একবারে ম্লেচ্ছ এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে. ইহারা এই দেশেই জন্মিয়াছেন এবং চিরদিন পর্য্যন্ত এই দেশের সঙ্গে সংস্রব করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং এই দেশীয় স্বভাব এবং আচার ব্যবহারাদি সমূলে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, বাঙ্গালী স্বভাবের প্রভা বিলক্ষণ প্রকাশিত হয়, সুতরাং ম্লেচ্ছ স্বভাব পূর্ণ মাত্রায় অধিকার করিতে পারিতেছে না। অতএব ইহারা বহুযত্ন করিলেও ম্লেচ্ছীয় স্বভাব, ও আচার ব্যবহারাদি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। আবার ম্লেচ্ছীয় শিক্ষা, ম্লেচ্ছীয় সংসর্গ এবং তীব্র অনুকরণের প্রভাবে ম্লেচ্ছীয় স্বভাবের দ্বারাও অতিশয় অভিভূত হইয়াছেন. সুতরাং বাঙ্গালীর স্বভাব ও আচার ব্যবহারাদির প্রকৃত মর্ম্ম বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না। দেশের সকল প্রকার আচার ব্যবহার ও স্বভাবাদিই ম্লেচ্ছীয় সংস্কারানুসারে. ইহারা সেই দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন। চুণোগলির ফিরিঙ্গিরা যেমন এদেশীয় ব্যবহার ও আচারাদিকে ম্লেচ্ছীয় ভাবে মিশাইয়া নূতন এক প্রকার অদ্ভুত ভাবে ধারণা করিয়া লয় ইহারাও সেইরূপই বুঝেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞানই হিন্দুর মুখ্যতম ধর্ম্ম, এবং যে যে শক্তির বিকাশ হইলে, কিম্বা যে যে অনুষ্ঠান

করিলে সেই তত্ত্বজ্ঞান বিকশিত হয়, তাহাই হিন্দু, ধর্ম্ম বলিয়া জানেন। কিন্তু ইহারা তাঁহাকে "রিলিজন" অর্থাৎ সমাজ বন্ধনের নিয়ম বিশেষ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের, মূর্ত্তি অধিষ্ঠানে বা শালগ্রামাদি যন্ত্রে সগুণ ব্রহ্মোপাসনাকে "আইডলেটারি" পুত্তল পূজা বলিয়া বুঝেন। সর্ব্বগুণ ক্রিয়াতীত সর্ব্বব্যাপক চিৎস্বরূপ ব্রহ্মকে "গড" অর্থাৎ স্বর্গবাসী স্পিরিট বলিয়া বুঝেন। অহেতুকীভক্তি বা স্বাভাবিক অনুরাগকে কৃতজ্ঞতা বলিয়া বুঝেন, এবং আধ্যাত্মিক ঘটনা বিশেষ শ্রাদ্ধকে "সেরিমনি" বলিয়া বুঝেন। এইরূপ, আত্মা মন, জ্ঞান, ধ্যান প্রভৃতি সকল পদার্থ ও সমস্ত আচার ব্যবহারকেই বিলাতী দৃষ্টিতে বুঝিয়া থাকেন। দেশীয় কোন বিষয়েরই প্রকৃত মর্ম্মে প্রবেশ করিতে পারেন না। এই গেল এক সম্প্রদায়ের কথা। যাঁহারা এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহেন তাঁহাদেরও সংস্কৃত ভাষায় প্রায় সকলেরই অধিকার নাই, সুতরাং এইরূপ অবস্থায় শাস্ত্রাধ্যয়ন করা এবং তাহার গূঢ় রহস্য সকল হৃদয়ঙ্গম করা এককালে অসম্ভব বলিলেই হয়। তৎপর উপযুক্ত গুরুও নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য বস্তু, সুতরাং শাস্ত্রাধ্যয়নে যে যে উপকরণ আবশ্যক হয়, তৎসমস্তেরই সম্পূর্ণ অভাব বলিতে পারা যায়। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত শাস্ত্রবোদ্ধা অতি বিরল।

কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা যে অভিনব সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া আসিলাম তাঁহাদের অসাধ্য কার্য্য অতি অল্প। তাঁহারাত নিজে ফিরিঙ্গি সাজিয়াছেন আবার আমাদের হৃদয়ের ধন শাস্ত্রগুলিকেও লইয়া ফিরিঙ্গি করিবার চেষ্টায় আছেন। সকল সমাজে সকল অবস্থাতেই এই প্রকার ফিরিঙ্গিবৎ জীবের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কলির পূর্ব্বে ঋষিরা ইহাদের অসুর নামে অভিহিত করিতেন। সুতরাং প্রকৃতির নিয়ম বশে বর্ত্তমান সময়েও ঐ শ্রেণীর জীবের অভাব নাই। ইহারা আত্মাভিমানে একবারে অন্ধ। ইহাদের বিশ্বাস "আমি যাহা বুঝি তাহাই অভ্রান্ত তদ্ব্যতীত সমস্তই ভ্রান্ত ও অসার। এই অদ্ভুত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ইহারা এত ভীষণকার্য্য করে, যে, তাহা হিন্দুর অবর্ণনীয়। হিন্দুর একমাত্র সম্বল মহামূল্য শাস্ত্র সকল লইয়া ইহারা অতি জঘন্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। কখন বা আদিদেব ভগবান্ মনুদেবের সংহিতা লইয়া কর্ম্মনাশায় নিঃক্ষেপ করে, কখন বা পুরাণাদি ভক্তিপূর্ণ গ্রন্থ লইয়া পদদলিত করে, কখন বা ক্রোধে হিংসায়, ও ঈর্ষায় অধীর হইয়া হিন্দু সমাজের মস্তকে সদর্পে পদাঘাত করিয়া থাকে। দুর্দ্দশা ভারতের তাই এসব গুণধর মহাপুরুষদিগকে পৃষ্ঠে বহন করিতেছেন। আর দুর্ভাগ্য হিন্দু

সমাজের, যে, অবলীলাক্রমে নিজ পিতৃপুরুষদিগের উপর এইরূপ দুঃসহনীয় অপমান সহ্য করিয়া আসিতেছে। দুরদৃষ্ট আমাদের তাই এই ঘোর কলিতে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

এই সমস্ত ভয়ঙ্কর অসুর কুলের প্রবঞ্চনায় পাছে শাস্ত্রানভিজ্ঞ হিন্দুগণ প্রবঞ্চিত হন তজ্জন্য আমরা যথাসাধ্য শাস্ত্রের প্রকৃত সমালোচন করিয়া দেখাইতে অগ্রসর হইয়াছি। ভগবান্ করুন্ আমাদের উদ্যোগ ও যত্ন সফল হউক।

মনুসংহিতা।

বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত ভারতবাসীর বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের শাস্ত্রীয় কোন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইলে বহু প্রয়াস পাইয়াও অধিকাংশ সময় বিফল-মনোরথ হইতে হয় কেন? পূর্ব্বকালে লোকেরা যে সমস্ত বিষয় ইঙ্গিতমাত্রেই সহজে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইত; এখন সেই সমস্ত বিষয় যদি নানা ভাবে সরল হইতে সরলতর করিয়াও বুঝান যায় তথাপি

যেন মনঃপূত হয় না, যেন বুঝিলেও মনে ধরেণা। এরূপ হইবার কারণ কি? আবহমান কাল পুরুষ-পরম্পরায় যেভাষা, যেভাব, যেইঙ্গিত অতি সহজেই অল্পায়াসেই বুঝিয়া আসিতেছে, হঠাৎ উন-বিংশশতাব্দীতে পড়িয়া আজ সে সমস্ত ক্ষমতা লুপ্ত হয় কিসে? এক বিদেশীয় শিক্ষাই ইহার মূল কারণ! না জানি কেমন যেন দিন দিনই ভারত-বাসীর মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ রূপে বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছে। অস্থি মজ্জায়, রক্তে মাংসে, অণু পরমাণুতে, স্তরে স্তরে বিদেশীয় হাব ভাব অধিকতর ভাবে প্রবেশ করিতেছে। এখন এমনই অবস্থা আসিয়া উপস্থিত যে ভারতবাসীর নিকট শাস্ত্রীয় কোন বিষয় অবতারণা করিলে উহার প্রকৃত ভাবটী সেই বিদেশীয় ভাবাক্রান্ত মস্তিষ্করূপ ছাঁচে পড়িয়া একে-বারে লুপ্ত হইয়া এক অভিনব ভাবে গঠিত হয়। বিলাতী গুরু মিল্ স্পেন্সর, ডারউইন, হক্স্লি প্রভৃতির মতের সহিত মিলাইতে যাইয়া দেবতাকে বাঁদর গড়িয়া বসেন। আমরা প্রত্যেক বিষয়ই ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাইয়া থাকি। উদাহরণ স্বরূপে শাস্ত্রীয় কএকটি বিষয় যাহা শিক্ষিতেরা অতি গুরুতর বলিয়া মনে করেন উদ্ধৃত করিয়া পাঠক দিগকে দেখাইব।

মনু বলিতেছেন,—

জাতি মাত্রোপজীবীবা কামং স্যাদ্ব্রাহ্মণ ব্রুবঃ।
ধর্ম্ম প্রবক্তা নৃপতের্ন্ন তু শূদ্রঃ কথঞ্চন॥
যস্য শূদ্রস্তু কুরুতে রাজ্ঞোধর্ম্মবিবেচনং।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্টং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ॥
যদ্রাষ্টং শূদ্র ভূয়িষ্ঠং নাস্তিকাক্রান্তমদ্বিজং।
বিনশ্যত্যাশু তৎকৃৎস্নং দুর্ভিক্ষব্যাধিপীড়িতং॥

মনু, ৮ম অ, ২০। ২১। ২২।

অর্থ—যে রাজার রাজ্যে শূদ্রে ধর্ম্ম বিষয়ক বিচার করে, পঙ্কে পতিত গো যদ্রূপ আত্মত্রাণে অশক্ত হইয়া তাহাতে মগ্ন হয় তদ্রূপ উক্ত রাজার রাষ্ট্র সেই অধর্ম্মে অবসন্ন হয়। যে রাজ্যে অনেক শূদ্রের বসতি এবং পরলোকাভাববাদী নাস্তিকজনে আক্রান্ত, ব্রাহ্মণ-বিহীন সেই রাজ্যে দুর্ভিক্ষ রোগ মরণাদি উপসর্গে নষ্ট হইয়া যায়।

আবার বলিতেছেন—

এক জাতি দ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্য প্রভবোহিসঃ॥
নামজাতিগ্রহং ত্বেষামভিদ্রোহেণ কুর্ব্বতঃ।
নিঃক্ষেপ্যোহয়োময়ঃ শঙ্কুর্জ্বলন্নাস্যে দশাঙ্গুলঃ॥

ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্ব্বতঃ।
তপ্তমাসেচয়েত্তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রেচ পার্থিবঃ॥
যেন কেনচিদঙ্গেন হিংস্যাচ্চেচ্ছেষ্ঠমন্ত্যজঃ।
ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্য তন্মনোরনুশাসনং॥
পাণিমুদ্যম্য দণ্ডং বা পাণিচ্ছেদনমর্হতি।
পাদেন প্রহরন্ কোপাৎ পাদচ্ছেদনমর্হতি॥
সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাংকৃতাঙ্কোনির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ॥
অবনিষ্ঠীবতোদর্পাদ্দ্বাবোষ্ঠৌ চ্ছেদয়েন্নৃপঃ।
অবমূত্রয়তোমেঢ্রমবশর্দ্ধয়তোগুদং॥
কেশেষু গৃহ্নতোহস্তৌ ছেদয়েদবিচারয়ন্।
পাদয়োর্দ্দাঢিকায়াঞ্চ গ্রীবায়াং বৃষণেষুচ॥

মনু, ৮ম অ; ২৭০। ২৭১। ২৭২। ২৭৯।
২৮০। ২৮১। ২৮২। ২৮৩।

অর্থ,—শূদ্রজাতি যদি ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণকে কঠিন বাক্য দ্বারা ভর্ৎসনা করে তবে ঐ শূদ্র জিহ্বাচ্ছেদন-রূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, কারণ সে জঘন্য জাতি হইতে উৎপন্ন। রে যজ্ঞদত্ত ব্রাহ্মণাধম! এইরূপ সম্বোধন করিয়া শূদ্র যদি দ্বিজাতির উপর আক্রোশ করে তবে ঐ অপরাধে উহার মুখে জ্বলন্ত দশাঙ্গুলী পরিমি

প্ত লৌহময় শলাকা নিক্ষেপ করিবে। তোমাদের এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, দর্প করিয়া শূদ্র যদি দ্বিজাতিকে এই-রূপ ধর্ম্মোপদেশ দেয় তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল প্রক্ষেপ করিবেন। শূদ্র করচরণাদির মধ্যে যে অঙ্গ দ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতিকে আঘাত করে রাজা উহার সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন এই মনুর আজ্ঞা। শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবার জন্য হস্তো-ত্তলন করে অথবা পাদোত্তলন করে তবে হস্তোত্তলনে হস্তচ্ছেদ ও পাদোত্তলনে পদচ্ছেদ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্র যদি একাসনে উপবেশন করে রাজা উহার কটিদেশে লৌহময় তপ্ত শলাকায় অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে বহিস্কৃত করিবেন অথবা যেন না মরে এইরূপে তাহার পাছা কাটিয়া দিবেন। দর্প করিয়া যদি কেহ ব্রাহ্মণের গাত্রে শ্লেষ্মা দেয় তাহাতে ওষ্ঠাধর চ্ছেদন করিবে; প্রস্রাব করিয়া দিলে লিঙ্গ ও সর্দ্দন (বাতকর্ম্ম) করিলে গুহ্য চ্ছেদন করিবেন। শূদ্র অহঙ্কারে যদি হস্ত দ্বারা ব্রাহ্মণের কেশ গ্রহণ করে তবে উহার হস্তদ্বয় ছেদ করিবেন। হিংসা জন্য, পাদদ্বয় গ্রহণে চিবক স্পর্শে, গ্রীবা, অণ্ডকোষ গ্রহণে হস্তদ্বয় চ্ছেদন দণ্ড করিবেন।

মনুর এই শ্লোক কয়েকটী পাঠ করিয়াই হয়ত এখনকার শিক্ষিতেরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবেন।

সাম্যের অবমাননা দেখিয়া ক্রোধে হুতাশনবৎ হইবেন. এবং শাস্ত্রকারদের প্রতি, অজস্র গালি বর্ষণ করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইবেন ফলে সমগ্র মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে কেবল মাত্র পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী শ্লোকে ঐরূপ কঠোর ভাবে শূদ্রের প্রতি শাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। আর কুত্রাপি এরূপ ভাবে লক্ষ্য করিয়া শূদ্রের প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা হয় নাই। বরং নানাস্থানেই দ্বিজাতিদের প্রতি উপদেশ আছে যে কদাচ শূদ্রের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা করিও না।

এখন দেখা যাউক সর্ব্বতত্ত্বদর্শী 'সাম্যের মূর্ত্তির' স্বরূপ, অপক্ষপাতিত্বের অবতার, স্বয়ং ঈশ্বর স্বরূপ মনুদেব কিরূপে এরূপ বৈষম্য দৃষ্টিতে শূদ্রের প্রতি ঘোর নিগ্রহের ভাব প্রকাশ করিলেন? স্থিরবুদ্ধি, শান্তচিত্ত ধর্ম্মপিপাসু কথায় কথায় মনুসংহিতাকে কর্ম্মনাশায় নিক্ষেপ না করিয়া, সরলভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করিবেন যে, যে মনুদেব তাঁহার স্বকীয় সংহিতায় অতি গুরুতর গুরুতর বিষয় কত সহজে মীমাংসা করিয়াছেন, ধর্ম্মরাজ্যের অতিদুর্জ্ঞেয় গভীরতম তত্ত্ব সকল সুবিস্তারে উপদেশ দিয়াছেন, রাজ্য শাসনের চূড়ান্ত প্রণালী সমস্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, এক কথায় মানব জাতির আবশ্যকীয় যাহা কিছু

তৎসমস্তই অতি সুবিজ্ঞের ন্যায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে উপদেশ দিয়া কেবল এক শূদ্রের সময়ই এরূপ খড়্গা-হস্ত হইলেন কেন ? অবশ্য ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে। এইরূপ বিচার দৃষ্টিতে, ন্যায়ের দৃষ্টিতে যদি আমরা আলোচনা করি তাহা হইলে আমরা অনেক পরিমাণে শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম হইতে পারি।

প্রথমতঃ আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিতেরা কল্পনাবলেই হউক আর প্রজ্ঞাবলেই হউক, ধরিয়ালয়েন যে "আর্য্যেরা কোন অনির্ণীত স্থান হইতে আসিয়া ভারতবর্ষস্থ অনার্য্য জাতিদের পরাজয় করিয়া আপনা-দের-ভৃত্যবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন।" ইহারাই পরে শূদ্র নামে অভিহিত হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এত প্রাচীন ও অসংখ্য আর্য্য শাস্ত্রের কোন স্থানে ওরূপ অভিনব কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে শূদ্রদের তাঁহারা আরও নীচ করিয়া দেন। কিন্তু ব্রহ্মাণাদি জাতি শূদ্রদের রাক্ষসের ন্যায় অত নীচ মনে করিতেন না। ইহারা জাতি বা প্রকৃতিগত নীচ হইলেও মূল যোনি হইতে নীচ নহে। উহারাও ভারত বর্ষীয় বংশ সমুদ্ভূত।

আমাদের যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র প্রকৃতি-পূজক। বিভিন্ন প্রকৃতির দ্বারাই বর্ণ চতুষ্টয়ের সৃষ্টি এবং প্রকৃতি

অনুসারেই ধর্ম্মানুষ্ঠান ভেদ। প্রকৃতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া আর্য্য শাস্ত্রকারগণ সম্পূর্ণ সাম্য ভাবে অধিকারী ভেদে ব্যবস্থা দিয়াছেন। অর্থাৎ যাহার যেরূপ অধিকার তিনি সেইরূপ কার্য্য করিবেন, তাহা হইলেই সংসার সুশৃঙ্খলে শাসিত হইবে এবং সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে। নচেৎ প্রাকৃতিক নিয়মের অসামঞ্জস্য বশতঃ সমস্তই মহাপ্রলয়ে বিলীন হইবে।

যিনি মনুসংহিতা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন তিনিই দেখিয়াছেন যে আদি পুরুষ মনুদেবই কেবল সংসারে প্রকৃত সাম্যের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যদি বলেন তবে শূদ্রের প্রতি এত কঠোর দণ্ডাজ্ঞা কেন? আমরা বলি তিনি "শূদ্রকে ঘৃণার চক্ষে" দেখিয়া কোন রূপ দণ্ডের সৃষ্টি করেন নাই, শাসনের জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সংসারে প্রকৃত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য, অন্যায় কার্য্যেরই দণ্ড বিধান করিয়াছেন সত্য। কেননা আমরা অন্যস্থলে দেখিতে পাই যে যদি একজন ব্রাহ্মণও কোন শাস্ত্র নিষিদ্ধ অধর্ম্ম প্রবর্ত্তক কোন অন্যায় কার্য্য করেন তাঁহাকেও প্রায় ঠিক উক্তরূপ দণ্ড দেওয়া বিধি রহিয়াছে। যথা—

অষ্টাপাদ্যন্তু শূদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিল্বিষং।
ষোড়শৈব তু বৈশ্যস্য দ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়স্য চ।

ব্রাহ্মণস্য চতুঃষষ্টিঃ পূর্ণং বাপিশতং ভবেৎ।
দ্বিগুণা বা চতুঃষষ্টিঃ স্তদ্দোষ গুণঃবিদ্ধি সঃ॥
মনু ৮ম, ৩৩৭। ৩৩৮।

দোষজ্ঞ শূদ্র যদি চুরি করে, যে দণ্ড শাস্ত্রোক্ত, উহার আট গুণ ঐ শূদ্রের দণ্ড হইবে এতাদৃশ বৈশ্যকে ষোড়শ গুণ দণ্ড করিবেন, ঐরূপ ক্ষত্রিয়কে ছত্রিশ গুণ দণ্ড বিধান করিবেন; ব্রাহ্মণকে চৌষট্টি গুণ দণ্ড করিবেন, অথবা অতিশয় গুণবান্ ব্রাহ্মণের শতগুণ অপেক্ষা গুণীকে একশত আটাইশ গুণ দণ্ড করিবেন।

সুরাং পীত্বা দ্বিজোমোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাংপিবেৎ।
তয়া স্বকায়ে নির্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ॥
গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা পিবেদুদকমেব বা।
পয়োঘৃতং বা মরণাদ্দোশকৃদ্রসমেব বা॥
যস্য কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাব্যতে সকৃৎ।
তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি॥
মনু ১১শ অঃ, ৯১। ৯২। ৯৮।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যদি জ্ঞান পূর্ব্বক সুরা পান করে তবে ঐ পাপক্ষয়ার্থ অগ্নিবর্ণ অর্থাৎ জ্বলন্ত সুরা পান করিবে উক্ত সুরা দ্বারা স্বদেহ নির্দগ্ধ হইলে ঐ পাপ হইতে মুক্ত হয়। অথবা অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত

গোমূত্র বা জল দুগ্ধ গব্যঘৃত গোময় জল এই সকল এতক্ষণ পান করিবে যে পর্য্যন্ত না মরে, মরিলে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্রাহ্মণের দেহাবস্থিত মেদ মদ্যে একবারও সংস্পৃষ্ট হয় তাঁহার ব্রহ্মণ্য নষ্ট হয় তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। *

যেখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কেহই অন্যায় কার্য্য করিয়া মনুরহস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই, তখন শূদ্র কেন অন্যায় কার্য্য করিয়া পরিত্রাণ পাইবেন? আর এক কথা, একজনের চারিটী সন্তান আছে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ অতি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, এবং পরিবার প্রতিপালন পক্ষে বড়ই সহায়ক। আর কনিষ্ঠ অত্যন্ত কদাচারী, কদাহারী ও অন্যান্য নানা দোষে কলঙ্কিত এবং তাহার নিজ প্রকৃতির দোষে সময়ে সময়ে জ্যেষ্ঠের প্রতি নানারূপ অহিতাচরণ করিয়া থাকে। এখন যদি পিতা কনিষ্ঠপুত্রের শাসনের জন্য জ্যেষ্ঠকে বলিয়া দেন যে যখন তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এইরূপ অন্যায়াচরণ করিবে, তখন তাহাকে নানারূপ কঠোর শাস্তি দিয়া শাসন করিবে। তাহা হইলে কি পিতা সন্তানের উপর শত্রুর ন্যায় আচরণ করিলেন না মিত্রের ন্যায় আচরণ

* এক মনু সংহিতা হইতেই এরূপ বহুতর শ্লোক উদ্ধৃত করা যায়। স্থানাভাব বশতঃ অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

করিলেন?, তাঁহার পুত্রস্নেহ দৃষ্টিতে সকল সন্তান সমান। কিন্তু তিনি তাঁহার সুবুদ্ধি সন্তানের অন্যায় আচরণে একরূপ সামান্য দণ্ড বিধান করেন এবং দুষ্ট সন্তানের জন্য অন্যরূপ অপেক্ষাকৃত কঠোর দণ্ড বিধান করেন। এ বিচারে পিতার ন্যায়পরতাই প্রকাশ পায়। এরূপ আচরণকে অন্তসারবান মহাত্মাগণ কথনই নিষ্ঠুর আচরণ বলেন না। তবে শূদ্র যে কার্য্যের জন্য দণ্ডার্হ সেগুলি প্রকৃত অন্যায় কার্য্য কিনা তাহা অবশ্য বিচার্য্য। এবং ব্রাহ্মণেরা নিম্ন শ্রেণীর জাতির প্রতি যদি শূদ্রোচিত অন্যায়াচরণ করেন তাহা হইলে তাঁহারা যা কেন, শূদ্র, ব্রাহ্মণের উপর অন্যায় আচরণ করিলে তাহাদের উপর যে ভাবে যেরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ তুল্য দণ্ডার্হ না হইবেন এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করা যাউক।

উদ্ধৃত শ্লোক পাঠে ইহা পরিষ্কার জানা যাই-তেছে, যে, ভগবান মনুদেব শূদ্রাদি জাতিদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া কেবল তাহাদেরই উপর কোনরূপ কঠোর নিয়ম এবং শাসনাদির ব্যবহার করেন নাই। যে দোষী যে পাপী তাহারই উপর তিনি তীব্র দণ্ডাজ্ঞার আদেশ করিয়াছেন। পাপী ব্রাহ্মণই হউন, আর শূদ্রই হউন; অথবা ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্যই হউন মনুর শাসন সাগরতরঙ্গের ন্যায় সকলের উপর সমভাবে সংক্রামিত

হইত। যদি স্বয়ং সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতির জন্মদাতা পিতা, এবং তাঁহারই পরম বন্দনীয় আচার্য্য দেব, একান্ত আত্মীয় বন্ধু, অতীব প্রাণপ্রতিম পুত্র, স্নেহের মূর্ত্তিস্বরূপিণী মাতা, প্রাণাধিক প্রিয়তমা ভার্য্যা, নিত্য শুভানুধ্যায়ী পুরোহিত প্রভৃতি গুরু ও স্বজনবর্গও কোনরূপ পাপাচরণে অপরাধী হন তথাপি রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবেন না। এমন কি স্বয়ং রাজাও যদি দোষী হন তাঁহাকেও মনুর মতে উপযুক্ত দণ্ডের ভাগী হইতে হইবে। মনু বলিতেছেন,—

পিতাচার্য্যঃ সুহৃন্মাতা ভার্য্যা পুত্রঃ পুরোহিতঃ।
নাদণ্ড্যোনাম রাজ্ঞোঽস্তি যঃ স্বধর্ম্মে ন তিষ্ঠতি॥
কার্ষাপণং ভবেদ্দণ্ড্যো যত্রান্যঃ প্রাকৃতোজনঃ।
তত্র রাজা ভবেদ্দণ্ড্যঃ সহস্রমিতি ধারণা॥

মনু, ৮ম, ৩৩৫।৩৩৬।

অর্থ।—পিতা আচার্য্য সুহৃৎ পুত্র মাতা ভার্য্যা পুরোহিত ইহাঁরা যদি স্বধর্ম্মে না থাকেন ইহাঁদিগকেও দণ্ড করিতে ত্রুটি করিবেন না। যে অপরাধে রাজা ভিন্ন অন্য প্রাকৃত জনের একপণ দণ্ড হইতে পারে, এরূপ অপরাধ যদি রাজা স্বয়ং করেন তবে রাজার সহস্র পণ দণ্ড হইবে।

এক্ষণে কথা উঠিতে পারে "স্বীকার করিলাম যে

ভগবান্ মনুদেব সকলেরই উপরই দণ্ডের বিধান করিয়াছেন। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হইতে অতি দীনহীন সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত, সমস্ত জাতির শীর্ষ স্বরূপ ব্রাহ্মণ জাতি হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত, কেহই মনুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই জানিয়াছি যে এতগুলি শ্লোকের মধ্যে কোন স্থানেই দেখিলাম না যে এক প্রকার পাপের জন্য সকলকেই সমান দণ্ডের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যেমন মনে করুণ যে বেদাদি শাস্ত্র ব্রাহ্মণের পক্ষে নিত্য অধ্যয়ন বিধি করিলেন, সেই বেদ শূদ্রের অধ্যয়নত দূরের কথা, শ্রবণ করিলেও ঘোরতর কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। যেমন মনে করুণ ব্রাহ্মণ বৈশ্য ক্ষত্রিয় ইহাঁদের মধ্যে যদি কেহ সুরা পান করেন তাহা হইলে অগ্নিবর্ণ অর্থাৎ জ্বলন্ত সুরা পান করিয়া স্বদেহ দগ্ধ করিতে আজ্ঞা দেওয়া হইল। কিন্তু যদি কোন শূদ্র সুরা পান করেন, তাহা হইলে তাহার এই অধর্ম্মাচরণের কোনই শাসন নাই। আবার যদি কোন শূদ্র ব্রাহ্মণকে আঘাত করে, তাহা হইলে তাহার প্রতিঅতি ভীষণ দণ্ডের আজ্ঞা ব্যবস্থা হইল। অথচ একজন ব্রাহ্মণ যদি অন্য একজন ব্রাহ্মণকে প্রহার করেন, তবে সামান্য দণ্ডেতেই নিষ্কৃতি পাইবেন। দ্বিতীয়তঃ যেস্থলে পাপের কোনরূপ সম্ভবনাই নাই, প্রত্যুত পরম

উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে সেখানেও শূদ্রের জন্য দ্বার অবরুদ্ধ। তাহা হইলে ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে মনু শূদ্রাদি ব্যক্তি বিশেষকে স্বতন্ত্র চক্ষে দেখিতেন।"

এ আপত্তিটি শ্রোতব্য বটে। আজকাল সাধারণতঃ শাস্ত্রবিরোধীগণ এই আপত্তিটা লইয়াই তুমুল আন্দোলন করিয়া থাকেন। এবং ইহা যে একবারে গর্হিত ইহার কোন উত্তর অথবা সামঞ্জস্য নাই ইহাই স্থির করিয়া আপনাদের গণ্ডি গাড়িয়া বসেন। কিন্তু এটি সাধারণতঃ যত গুরুতর বলিয়া মনে হয় তত গুরুতর নহে। তবে কি না আমাদের দৃষ্টিটা নিতান্তই বিকৃত হইয়াছে, নিজের অস্তিত্বটা একবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে! আমরা সূচনাতেই বলিয়া আসিয়াছি যে যাহা কিছু আমরা দেখিব শুনিব বা বুঝিব তৎসমস্তই আমরা বিদেশীয় ভাবে দেখিতে শুনিতে বা বুঝিতে চাই। আমাদের দেশীয় দৃষ্টিটা একবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। শাস্ত্রকে আর দেশীয় চক্ষে দেখিতে পারি না; সুতরাং শাস্ত্র সম্বন্ধেও আমাদের দেখা, শুনা কিংবা বুঝা সমস্তই অন্যরূপ হইয়া পড়ে।

প্রথম দেখা যাউক শূদ্রাদির বেদাদি শাস্ত্র "অধ্যয়ন" করা নিষেধ বা পাপজনক বলিয়া গণ্য হইবে কিসে? এই

বিষয়টি বুঝিতে হইলে প্রথমে "অধ্যয়ন" কাহাকে বলে, ঋষিরাই বা "অধ্যয়ন" শব্দ কি অর্থে ব্যবহার করিতেন এবং সেরূপ অধ্যয়নের ফলই বা কি হইত এই সমস্ত বিষয় গুলি বিশেষ করিয়া আলোচনা করা বিধেয়। তৎপর তখন শূদ্র অর্থে কি বুঝাইত এবং যাহা বুঝাইত তাহাতে শাস্ত্রাধ্যয়নে ক্ষমতা থাকিলে কি ফল হইত তাহা দেখা আবশ্যক। আজ কাল যেরূপ অধ্যয়নের প্রথা প্রচলিত এরূপ অভিনব অভূতপূর্ব্ব অধ্যয়নের প্রণালী এ দেশে কোন কালেই প্রচলিত ছিলনা। বিদেশীয় স্কুল শিক্ষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই নূতন ধরণের সৃষ্টি হইয়াছে। আমার একটি গল্প মনে আসিল! নিজের এবং পাঠকগণের পরিতৃপ্তির জন্য এই স্থলেই সন্নিবেশিত করিলাম।

কোন সময় একদিবস রাত্রিকালে নৈহাটির কএক-জন মদ্যপায়ী বাবু উন্মত্তাবস্থায় সকলে যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন যে, আজ রাত্রিটা বাঁচ খেলিয়া কাটাইব। সকলে গঙ্গায় আসিয়া একখানি নৌকায় উঠিয়া একজন হাল ধরিলেন এবং অন্যান্য সকলে দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিলেন। নৌকায় রক্ষক কেহই ছিলনা। সুতরাং নেশার ঝোঁকে মনের স্ফূর্ত্তিতে সমস্ত রাত্রি দাঁড় টানিয়া মনে করিলেন যে না জানি কতদূর আসিয়াই পড়িয়াছি, আজ আর না; এই খানেই বিশ্রাম লওয়া যাউক।

এই বলিয়া ক্ষণকালের জন্য তন্দ্রাযুক্ত হইলেন। এদিকে রাত্রিও প্রভাত হইল ! বাবুগণের নেশার ঝোঁকও কতক পরিমাণে উপশমিত হইল। উঠিয়া দেখেন নৌকাখানি একটিসুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকায় যেখানকার নৌকা সেই খানেই আছে তাঁহারা বৃথা সমস্ত রাত্রি পণ্ডশ্রম করিয়াছেন।

আমাদেরও শিক্ষার অবস্থা ঠিক ঐরূপই হইয়াছে। আমারাও সেইরূপ উন্মত্তাবস্থায় পড়িয়া মনের স্ফুর্ত্তিতে আপন আপন মনোবৃত্তিরূপ ক্ষেপণী দ্বারা বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্ররূপ নৌকা খানিকে টানাটানি করিয়া বাহিয়া লইতেছি, কিন্তু যখন আমাদের এই উন্মত্তাবস্থ অন্তর্হিত হইবে অর্থাৎ যখন প্রাকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইব, তখন দেখিব যে সমাধিপরিমার্জ্জিত নিতান্ত নির্ম্মলচেতা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ঈশ্বরকল্প ঋষিগণের হৃদয় স্থূর্ণাতে বেদ নৌকা সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে। কাহার সাধ্য যে ক্রীড়ার ছলে সেই অনন্ত জ্ঞান পরিপূরিত বেদাদি শাস্ত্র-তরণী রেখা মাত্র অপসারিত করিতে পারে? অথচ আমরা চিরদিন পর্য্যন্ত কত পরিশ্রম, কত বল ক্ষয়, কত বুদ্ধি ক্ষয় করিয়া আসিলাম কিন্তু যেখানকার বেদ সেই খানেই থাকিল আমাদের পরিশ্রম বৃথা হইল। তাই বলিতেছিলাম আমাদের যে অধ্যয়ন ইহা ঋষিদিগের কথিত অধ্যয়নের সহিত তুলনীয়ই নহে!

সে অর্থে আমাদের অধ্যয়ন "অধ্যয়ন" পদ বাচ্যই হইতে পারে না। ইহাতে কেবল বুদ্ধি ক্ষয়, বল ক্ষয়, আয়ুক্ষয়, আত্মার অধোগতি প্রভৃতি যাবতীয় অনিষ্টই সংঘটিত হয়, কোনরূপ কল্যাণের আশা একবারেই অসম্ভব। ফলতঃ, এরূপ অধ্যয়নে কেবল শূদ্র কেন, যবন, ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল প্রভৃতি সমস্ত জাতিরই (বেদ হইতে তন্ত্র পর্য্যন্ত যে কোন শাস্ত্র) সমান অধিকার আছে। এরূপ "বিলাতি অধ্যয়নে" শাস্ত্রের কোন আপত্তিই নাই। তবে যে "অধ্যয়নে" শাস্ত্র কেবল 'বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের প্রতি বাধা দিয়াছেন, সে "অধ্যয়ন" কাহাকে বলে প্রথমে তাহাই যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

প্রাচীনকালে "অধ্যয়ন" কথার অর্থে তিনপ্রকারে শাস্ত্রার্থ গ্রহণ করা বুঝাইত। প্রথম শাস্ত্রের বাক্যার্থ গ্রহণ করা,—অর্থাৎ শাস্ত্রের আদ্যোপান্ত কথাবলী শ্রবণ করিয়া তৎসমস্তের প্রকৃত বাক্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করা। দ্বিতীয়, শাস্ত্রীয় বাক্যাবলীর দ্বারা যে অর্থ জানা হইল, তাহাকে আবার নানাপ্রকার সদ্যুক্তি ও মীমাংসা দ্বারা অবধারণ করা। তৃতীয়, সেই বিষয়গুলি আপন হৃদয়ে অনুভব করা, অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী সুখ, দুঃখ প্রভৃতি যেরূপ অন্তরে অন্তরে সুস্পষ্ট মানসিক প্রত্যক্ষ করা হয়, সেইরূপ অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা। যতক্ষণ এই তিন প্রকার জ্ঞানের দ্বারা শাস্ত্রার্থ আয়ত্ত করা না হয়

ততক্ষণ পূর্ণ অধ্যয়ন হইল না। যদি কেবল বাক্যার্থ জ্ঞান বা যুক্তি জনিত জ্ঞান জন্মে, তবে অধ্যয়নের কিয়দংশ মাত্রই হইল, ইহা বলিতে হইবে; কারণ অধীত বিষয়ের অন্তরে অন্তরে প্রত্যক্ষ করাই অধ্যয়নের মুখ্য অঙ্গ এবং প্রধান লক্ষ্য। অবশ্যই, এখন বলা বাহুল্য যে এই তিন অঙ্গ বিশিষ্ট অধ্যয়ন কেবল অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রকাশকশাস্ত্র সম্বন্ধেই সম্ভবে, তদ্ব্যতীত যে সকল শাস্ত্র কেবল বাহ্যার্থ প্রকাশক তাহার অধ্যয়ন বিষয়ে এই নিয়ম সংলগ্ন হয় না। কারণ আধ্যাত্মতত্ত্ব যাহা কিছু আছে, তাহাই সুখদুঃখাদির ন্যায় অন্তরে অন্তরে মানসিক প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে; যেহেতু তাহা আমার হৃদয়ের মধ্যে আত্মার মধ্যেই আছে। কিন্তু যাহা বাহিরের বস্তু তাহা আমার আত্মার মধ্যে নাই; সুতরাং তাহা মনে মনে প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব, সেই জন্য তাহাদের কেবল ঐ শেষোক্ত জ্ঞানটি ভিন্ন প্রথম, ও দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানই হইয়া থাকে।

বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণ, ও ধর্ম্মসংহিতাদি সমস্ত শাস্ত্রগুলি আধ্যাত্ম তত্ত্ব প্রকাশক। সুতরাং তাহারই উক্ত তিন অঙ্গবিশিষ্ট অধ্যয়ন হইয়া থাকে। আর, প্রাকৃত-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, শরীরস্থান, শিল্পবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্র গুলি বাহ্যতত্ত্ব প্রকাশক, অতএব ইহাদের কেবল পূর্ব্ব কথিত দুই অঙ্গ

বিশিষ্ট অধ্যয়নই হইতে পারে, অর্থাৎ বাক্যার্থজ্ঞান আর যুক্তিও মীমাংসাজনিত জ্ঞান মাত্র হইতে পারে।

নিম্নলিখিত প্রমাণের দ্বারাই ইহা স্থিরীকৃত হইতে পারে। আমরা দেখিতেছি যে, মনু, উপনিষৎ (শ্রুতি) এবং বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রই, বেদ প্রভৃতি অধ্যাত্ম শাস্ত্র অধ্যয়নে অধিকারীর নিরূপণ করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই এইরূপ বলিয়াছেন যে সদাচার, সদাহার ও ব্রত অনুষ্ঠানের দ্বারা দেহ এবং মন হইতে সমস্ত তামস ও ও রাজস ভাব বিদূরিত হইয়া সত্ত্বগুণের বিকাশে চিত্ত সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা গ্রহণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ হইলে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। যথা মনু "নিষেকাদি শ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ। তস্য শাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন্ জ্ঞেয়ো নান্যস্য কস্যচিৎ॥" ভাবার্থ,—নিষেক অবধি সমস্ত প্রকার সংস্কারের দ্বারা যাঁহার দেহও আত্মা নিতান্ত নির্ম্মলীকৃত হইয়াছে, তাঁহারই এই ধর্ম্মসংহিতা অধ্যয়নের অধিকার আছে। যাহাদের দেহ ও আত্মা ঐরূপ বিশুদ্ধ হয় নাই, তাহাদের এই শাস্ত্র অধিকার নাই।" এবং "উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ। আচারং অগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেবচ।" ভাবার্থ,—আচার্য্য, বেদাধ্যাপনের নিমিত্ত শিষ্যকে উপনীত করাইয়া দেহ ও আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত প্রথম

শৌচ শিক্ষা দিবেন এবং আচার, অগ্নিপরিচর্য্যা, সন্ধ্যোপাসনা শিক্ষা করাইবেন"।

"ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা, স্বয়ং জুহুতে একর্ষিং শ্রদ্ধাবন্তঃ। তেষামেবৈতাং ব্রহ্ম বিদ্যাং বদেত্তং শিরোব্রতং বিধিবদ্যৈস্তু চীর্ণং (ঋক্) ভাবার্থ.—"যাঁহারা পবিত্রীকৃতদেহান্তরাত্মা আত্মানিষ্ঠ এবং একর্ষি নামক অগ্নিহোমকারী, নিতান্ত শ্রদ্ধাবান্, যাঁহারা রীতিমত শিরোব্রত আচরণ করিয়াছেন এইরূপ ব্রাহ্মণদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে" "তান্ হ স ঋষিরুবাচ ভূয়এবতপসা শ্রদ্ধয়া ব্রহ্মচর্য্যেণ সম্বৎসরং সম্বৎস্যথ যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত, × ×"—প্রশ্নোপনিষদ।

সুকেশা, শৈব্য, গার্গ, আশ্বলায়ন ভার্গব, কবন্ধি এবং কাত্যায়ন প্রভৃতি ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণকুমারগণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ পিপ্পলাদ মহর্ষির নিকট উপনীত হইলেন। পিপ্পলাদ মহর্ষি বলিলেন "হে ব্রাহ্মণ কুমারগণ তোমরা যে কিছু ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়াছ তাহাতে তোমাদের চিত্ত অধ্যাত্মতত্ত্বাধ্যয়নের উপযুক্ত হয় নাই, অতএব আরও একবৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, এবং শ্রদ্ধাতিশয্য সহকারে সন্তোষ কর, তৎপর যাহা ইচ্ছা প্রশ্ন কর, কারণ তাহা হইলেই তোমাদের বুঝিতে অধিকার জন্মিবে" এইরূপ শত শত স্থানে অধিকারীর বয়স লিখিত আছে।

এখন ভাবিয়া দেখুন, অধ্যয়ন যদি কেবল শ্রবণ জন্য জ্ঞান আর বিচার তর্কজনিত জ্ঞানই হইত, তবে অধিকারী লইয়া এত পীড়াপীড়ী কেন? বাক্যার্থ জ্ঞান আর বিচার তর্কের দ্বারা আনুমানিক জ্ঞান হইতে হইলে এত তপস্যা এত ব্রহ্মচর্য্য এত কঠোর তিতিক্ষাদির দ্বারা দেহ ও মনকে এত নির্ম্মল বিশুদ্ধ ও পাপমুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিতে বলিবেন কেন? ঐরূপ জ্ঞানত যে কোন অবস্থায় যে কোন রকমেই হইতে পারে? কিন্তু তৃতীয় প্রকার জ্ঞান, অর্থাৎ অধ্যাত্মতত্ত্ব সকলের মনে মনে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা সকলের নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মা নিতান্ত মলিন থাকে এবং কদাচার কদাহার কুব্রতাদির দ্বারা দেহ ও চিত্ত জড়িত হইয়া তম ও রজঃ শক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, ততক্ষণ সে ইন্দ্রিয়াদি বিনিবর্ত্তন করিয়া অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ করিতেই পারে না। তাহার অনুভব, চিন্তা, জ্ঞান, ধ্যান, সমস্তই বাহিরে বাহিরে পর্য্যবশিত হয়। সে অন্তঃসার শূন্য, অতএব তাহার ঐ তৃতীয় জ্ঞান অর্থাৎ আধ্যাত্মতত্ত্বের মানসিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, তাই অধ্যয়নের প্রাক্কমে দেহ ও মনকে প্রস্তুত করিতে বলিয়াছেন। অতএব আর্য্যগণ অধ্যয়ন বলিলে মুখ্য কল্পে মানসিক প্রত্যক্ষ করাই বুঝিতেন।

দ্বিতীয়তঃ, অনেকস্থলে সুস্পষ্টই উল্লেখ আছে যে,

অধ্যাত্ম শাস্ত্র হইতে বাক্যার্থ জ্ঞান এবং তাহার মানসিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে! "জ্ঞানবিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা কুটস্থোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ। * *" (ভগবদ্গীতা) "জ্ঞানং শাস্ত্রোক্ত পদার্থানাং পরিজ্ঞানং, বিজ্ঞানন্তু তথা জ্ঞাতানাং তথৈবানুভব করণম্। (শাং ভাষ্য)। "শাস্ত্রের বাক্যার্থ জ্ঞানকে 'জ্ঞান' আর সেই গুলিকে মনে মনে প্রত্যক্ষ করাকে বিজ্ঞান' বলে। যিনি শাস্ত্র পাঠজনিত জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের দ্বারা পরিতৃপ্ত ইত্যাদি।" এবং শ্রুতি, "বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ, সন্ন্যাস যোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধ সত্ত্বাঃ" ইত্যাদি,—"বেদান্ত শাস্ত্রের বাক্যার্থ বোধ এবং তাহার মানসিক প্রত্যক্ষদ্বারা যাঁহার প্রকৃতার্থের নিশ্চয় ধারণা হইয়াছে, * * " ইত্যাদি। অতএব দেখা গেল যে কেবল বাক্যার্থ জ্ঞান অথবা তর্ক বিষয় জনিত জ্ঞানকেই অধ্যয়ন বলিতেন না, কিন্তু তাঁহারা মানসিক প্রত্যাক্ষানুভব কার্য্যই মুখ্যাধ্যায়ন বলিয়া গণ্য করিতেন। অতএব যাহারা এইরূপ অধ্যয়নের ক্ষমতাবান্ তাহাদিগকেই বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের আদেশ আছে। আর যাঁহারা অক্ষম তাঁহাদিগকে অধ্যয়ন নিষেধ করিয়াছেন। সুব্রাহ্মণগণ অধ্যাত্মতত্ত্বানুভবে সক্ষম তাই তাঁহাদিগকে অধ্যয়ন বিধি দিয়াছেন, আর শূদ্রাদি এবং স্ত্রীলোক তাহাতে অক্ষম তাই তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। এমন কি ব্রাহ্মণ হইলেও যিনি

অব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছেন "স্ত্রী শূদ্র দ্বিজ বন্ধূনাং ত্রয়ীনশ্রুতি গোচরাঃ" (মনু) "স্ত্রীলোক, শূদ্র এবং অব্রাহ্মণ ইহাদিগের বেদধ্যয়ন বা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য নহে"।

এই বচনটি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে ঋষিগণ বিদ্বেষ পরবশ হইয়া বেদাদি অধ্যয়নের নিষেধ করেন নাই, কারণ যদি বিদ্বেষানুবর্ত্তি হইয়া নিষেধ করা হইত তবে কেবল শূদ্রকে নিষেধ না করিয়া অব্রাহ্মণ এবং স্ত্রীলোককেও নিষেধ করিবেন কেন? অবশ্যই তাঁহাদের মাতা, ভগ্নী, কন্যা প্রভৃতিও স্ত্রীলোক মধ্যেই ছিলেন এবং তাঁহাদেরই পুত্র পৌত্রাদিগণও কেহ না কেহ অব্রাহ্মণের কার্য্য করিত, তবে অব্রাহ্মণ মধ্যেও গণ্য হইত; অতএব তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ থাকা কখনই সম্ভবপর নহে। তবেই কেবলমাত্র সত্যানুরোধই ইহার কারণ বলিতে হইবে।

যদি জিজ্ঞাসা করেন শূদ্রাদি জাতি অক্ষম কিসে? তাহারাও মানুষ আমরাও মানুষ, উভয়েই একজনের সৃষ্ট, এ ভিন্ন ভেদ কেন? তাহার উত্তর আছে। তাহা সবিস্তারে আলোচনায় এস্থলে সময়ও নাই স্থানও নাই। অথবা প্রবন্ধান্তরে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব। আমের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট ফল দেখিলেই আমরা

আম বলিয়া থাকি। কিন্তু তাহার মধ্যে পরস্পরের গুণগত, আস্বাদনগত অনেক প্রভেদ থাকে। তদ্রূপ নামও বিভিন্ন হইয়া থাকে,—যেমন টক আম, আনারসে আম, রসুনে আম ইত্যাদি। যদি একটি রসুনে জাতিয় আম, "পুরুষানুক্রমে" কোনরূপে অন্য বৃক্ষের সহিত মিলিত না হইয়া, খাঁটিভাবে চলিয়া আসিয়া থাকে, এবং আপনি তাহার সুপক্ক বীজ লইয়া নানাবিধ উপাদেয় উপকাবানাদির দ্বারা তাহাকে অতি যত্ন সহকারে পরিপোষন ও পরিবর্দ্ধন করেন এবং সেই বীজ যদি আপনার ঐরূপ যত্নে সুবৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফল প্রসব করে, তাহা হইলেও কি তাহার সেই স্বভাব জাত রসুনে গন্ধ বিনষ্ট হইবে? কখনই না! আমরা ইহা প্রত্যক্ষ্য দেখিয়াছি যে স্বভাব জাত গুণ কিছুতেই নষ্ট হয় না। তবে যত্নে বৃক্ষ অধিক ফল প্রসব করিতে পারে, ফলের পুষ্টি সাধন হইতে পারে, কিন্তু স্বভাব কিছুতেই বিনষ্ট হইবে না! যশোহর দেশীয় "পোকধয়া" আমের বিষয় যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহাদের এ সম্বন্ধে অধিক বলিতে হইবে না। জগতে যাবতীয় দ্রব্যেই বাহ্যলক্ষণে এক জাতীয় হইলেও গুণগত ও প্রকৃতগত নানারূপ ভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলেই প্রাকৃতিক ঘটনাও প্রাসঙ্গিক অবস্থাই এই ভিন্নতার কারণ। সেইরূপ

মনুষ্যগণ একজাতীয় হইলেও তাহারা নানারূপ প্রাকৃতিক ঘটনা ও প্রাসঙ্গিক অবস্থা বলে প্রকৃতগত ভিন্ন হইয়া পড়ে। আমাদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য ও সুদ্র চারি জাতির সৃষ্টিও ঐ প্রাকৃতিক ঘটনাবলেই সংঘটিত হইয়াছে। এই প্রাকৃতিক সংঘটনের পরিবর্ত্তন একবারেই অসম্ভব। আর এক কথা, এই চারিটা জাতি সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে থাকিয়া আজ সহস্র সহস্র বৎসর চলিয়া আসিতেছে। কাহারও সহিত কোন দিন সংস্রব হয় নাই। যেখানেই কোন প্রকারে সংস্রব হইয়াছে সেইখানই শঙ্করবর্ণ উৎপন্ন হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। সুতরাং, নামা কারণেই এই চারি জাতির চারিটী প্রকৃতি পরস্পরে সম্পূর্ণ পৃথক হইওয়াই অধিক সম্ভব,—হইয়াছেও তাহাই। সুতরাং, সুদ্রাদি জাতি ও মানুষ হইয়া ঘটনাবশে স্বতন্ত্র প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই প্রকৃতিতেই সহস্র সহস্র বৎসর জন্মিয়া আসিতেছে। সুতরাং, ইহার পরিবর্ত্তন ও একরূপ অসম্ভব। ঋষিগণ শূদ্রের প্রকৃতিতে নিগূঢ় অধ্যাত্মচর্চ্চা অত্যন্ত অমঙ্গল জনক হইবে বুঝিয়াই শূদ্রদের কুশল কামনায়ই উহাদের শাস্ত্রাধ্যয়নে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাই বলিয়া ধর্ম্মপথে একবারে কণ্টক নিক্ষেপ করেন নাই। বরং, তাহাদের যেরূপ সাধনায় আত্মার কল্যান সাধিত হইতে পারে তাহা

অতি সরল ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। শূদ্রের তাহাতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ হইবে। ইহাতে তাঁহাদের নিষ্ঠুরতাত দূরের কথা, অসীম দয়ারই পরিচয় পাওয়া যায়।

আরও দেখুন, কেবল শূদ্র কেন বৈশ্য ক্ষত্রিয়দিগেরও সম্পূর্ণ অধ্যয়নে অনুমোদন করেন নাই "অধ্যেতব্যং নচান্যেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ং বিনা।" ভাবার্থ, ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহই পূর্ণ অধ্যয়ন করিতে পারিবেন না, বৈশ্য কোন কোন অংশ পড়িতে পারেন, ক্ষত্রিয়ও সকল পারেন না। ইহাতেও কি বিদ্বেষ পরবশতার আশঙ্কা মনে হয়?

অনেকে বলিতে পারেন যে অব্রাহ্মণদিগের অর্থাৎ পতিত ব্রাহ্মণদের যেরূপ অনুষ্ঠানাদির দ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়া অধ্যয়নের বিধি আছে, শূদ্রাদিরও ঐরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা অধিকারী হইয়া অধ্যয়নের বিধি নাই কেন? ইহার উত্তরে আমরা বলি, যাহার বীজ থাকে তাহারই সংস্কার সম্ভব, আর যাহার বীজই আদৌ নাই তাহার আর সংস্কার বা বিশোধন কি? ব্রাহ্মণের অধ্যাত্মতত্ত্বানুভবের ক্ষমতাবীজ আছে, তাহাই ব্রত-নিয়মচর্য্যাদির দ্বারা বিশোধিত হইলে অধ্যয়নের ক্ষমতা বিকসিত হইয়া থাকে। আর শূদ্রাদির সেই বীজ নাই, সুতরাং তাহার ব্রত নিয়মাদির দ্বারা সংস্কারও নাই,

অতএব তাহার সংস্কার পূর্ব্বক অধ্যয়নের বিধি কিরূপ থাকিবে?

একথায়ও অনেকের অনেক রকম আপত্তি হইতে পারে; কিন্তু তাহার মীমাংসার এখন সময় নাই, তবে একটিমাত্র কথা বলিব ইহার দ্বারাই অনেকটা বুঝিয়া লইতে পারিবে। জিজ্ঞাসা করি, ঋষিপ্রণীত অধ্যয়নের নিয়মটা ত অনেক দিন হইতেই শিথিল হইয়া গিয়াছে, অনেক দিন হইতেই ভারতবর্ষে শূদ্রাদি জাতি নানাপ্রকার শাস্ত্র পড়িয়া আসতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ঐ সকল অধ্যয়নের দ্বারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া, ব্রাহ্মণ ব্যতীত কয়জনকে প্রকৃত পরমহংস হইতে দেখিতে পাওয়া যায়? কিন্তু অন্বেষণ করিলে কেবল ব্রাহ্মণের মধ্যেই যাহা দুই চারিটি প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার অব্রাহ্মণের মধ্যেও শূদ্রের দশাই পরিলক্ষিত হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিলাম, যে, কেবল কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকাকারে শাস্ত্রীয় বাক্যাবলী অভ্যাস করিয়া স্থান বিশেষে তাহারই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করার নাম অধ্যয়ন নহে। কিন্তু সেই সমস্ত শাস্ত্রীয় শ্লোকের নানা প্রকার সদ্যুক্তি ও সাধু-মীমাংসার দ্বারা যে প্রকৃত অর্থ অবধারণ পূর্ব্বক সেই বিষয় গুলি নিজ হৃদয়ে অনুভব করা, অর্থাৎ দেহভ্যান্তরবর্ত্তী সুখ দুঃখ

প্রভৃতি যেরূপ অন্তরে সুস্পষ্ট মানসিক প্রত্যক্ষ করা যায়, সেইরূপ অন্তরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া যখন শাস্ত্রার্থ আয়ত্ত করিলাম তখনই আমার পূর্ণধ্যয়ন হইল। কেন না অধীত বিষয়ের অন্তরে অন্তরে প্রত্যক্ষ করাই অধ্যয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। এইরূপ অধ্যয়নেই প্রকৃত ফল পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত অধ্যয়নে আরও একটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। যেমন্ মনে করুন আমরা ভগবান্ কপিলদেবের একখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছি। সেই নিত্য বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ভগবান্ কপিলদেবের চিত্তের একান্ত একাগ্রতাবস্থার যোগস্থ হইয়া, আপনার অস্তিত্ব ব্রহ্মসত্তায়বিলীন করিয়া একবারে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তাবস্থায় তাঁহার অন্তরে যে সমস্ত জ্ঞানরাশী উদিত হইয়াছিল, তাহাই তিনি তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে অক্ষরাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এখন দেখুন, কেবল শ্রবণ মাত্রেই আমাদের মলিন কুসংস্কারাপন্ন আত্মাতেত সহজে সে সমস্ত জ্ঞানরাশি উপচিত হইতে চাহে না। এ অবস্থায় যদি মহর্ষি কপিলদেবের গ্রন্থ সর্ব্বদা পাঠ করি; তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস জন্য তাঁহার গ্রন্থ নিহিত ভাবনিচয় অল্পে অল্পে আমার আত্মার সংস্কারবস্থায় থাকিয়া যাইবে। কেন না "বিদ্যা অভ্যাসজঃ সংস্কার" অর্থাৎ অধ্যয়ন জন্য যে সংস্কার তাহার নাম বিদ্যা। ক্রিয়া মাত্রেরই একটি সংস্কার

থাকিয়া যায়, অর্থাৎ আমাদের মনে যে কোন ভাবেরই উদয় হউক না কেন, তাহার একটী সংস্কার থাকিয়া যায়। এখন ক্রমান্বয়ে একটী ভাবই যদি পুনঃ পুনঃ মনে উদয় হয় তাহা হইলে তাহার সংস্কারও ক্রমেই দৃঢ় হয়। এখন মনে করুন আমি ঋষি প্রণীত একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া সদ্যুক্তি ও সাধু চিন্তা দ্বারা গ্রন্থ নিহিত ভাব রাশি সংগ্রহ করিলাম, এই ভাব আমার আত্মার সংস্কারাবস্থায় থাকিয়া গেল। আমি যতই ঋষি প্রণীত গ্রন্থ সকল পাঠ করিব, ততই তাঁহাদের অন্তর্নিহিত উন্নত, পবিত্র, ও আত্মার উৎকর্ষসাধক ভাবরাশি আমার আত্মার সংস্কারাবস্থায় পরিণত হইয়া পুর্ব্বসংস্কার দৃঢ় করিবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার আত্মারও উন্নতি হইতে থাকিবে। আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের উপদেশাদি না পাইয়াও তাঁহাদের তপস্যা ও কঠোর সাধনলব্ধ ভাবসমুদ্রে বিভাসিত উপদেশ সমস্ত অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুষ্ঠানে মনোযোগী হইতে সক্ষম হইব। তখন অধ্যয়নের প্রকৃত ফল লাভ হইবে। সুতরাং, এখন বুঝাগেল এই, যে প্রাচীন কালে কার্য্য করার জন্যই অধ্যয়ন প্রচলিত ছিল। ইহা ব্যতীত, তাঁহাদের অধ্যয়নে স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার শুষ্ক বাহ্য মান মর্য্যাদা, উপাধি, সমাদর প্রভৃতি পাইবার

জন্য, কিম্বা কেবলমাত্র অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত, পুঁথিগত বা অক্ষরগত অধ্যয়ন সৃষ্টি হইয়াছে, যদ্দ্বারা মনুষ্যত্বের উপচায়ক কোন গুণই অর্জ্জন করা যায় না বরং অতিশয় পরিশ্রমজনিত জীবনের অনিষ্টজনক নানারূপ উপদ্রব আসিয়া উপচিত হয়, এরূপ বৃথা অধ্যয়নকে তাঁহারা অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। যে সময়ে; বেদাদি মহাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে, পাত্রাপাত্রে বিধি নিষেধ ছিল তখনকার অধ্যয়নের উদ্দেশ্যও সম্পুর্ণ ভিন্ন ছিল, তাহা আমরা পুর্ব্বেই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। দুঃখের বিষয় এই, যে, এ বিষয়টি সকলে অবগত নহেন; সুতরাং; এত বিবাদ। প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারিলে, এত বিবাদও থাকে না, দেবপূজ্য মনুদেবও আমাদের ন্যায় নরককীট দ্বারায়ও এরূপ তিরস্কৃত হন না।

তৎপর, যখন অধ্যয়নের উদ্দেশ্যই কার্য্য করা,— অর্থাৎ অন্তরে অন্তরে অনুভব করা, তবেই সংসারে কার্য্য করিতে হইলেই জানার আবশ্যক হয়, এবং জানিতে হইলেই, হয়, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাহারও নিকট "হাতে কলমে" শিক্ষা পাইয়াই হউক, অথবা মৌখিক উপদিষ্ট হইয়াই হউক, অধ্যয়ন করিতে হয়। উদাহরণ দ্বারা আর একটু বুঝাইব। মনে করুন আমাকে আহারাদি নির্ব্বাহের জন্য রন্ধন কার্য্য

করিতে হইবে। সুতরাং প্রথমে যে যে প্রক্রিয়ার দ্বারা রন্ধন কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, সেই সেই প্রক্রিয়া, আমার জানা আবশ্যক। যখন ঐ সমস্ত প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমার জ্ঞান জন্মিল, তখন উহা কার্য্যে পরিণত করিলে, আমার ইপ্সিত ফল লাভ হইল। কিন্তু, সেই প্রক্রিয়া গুলি অবগত হইবার আমার উপায় কি? আমি, যদি নিজ কল্পনা বলে, উহা সংসাধন করিতে যাই, তাহা হইলে হয়ত ইহজীবন অতিবাহিত হইয়া যাইবে, তথাপি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, সুতরাং, সুদক্ষ রন্ধন নিপুণ ব্যক্তির নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহারই উপদেশে আমাকে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এইরূপ অধ্যয়ন সম্পন্ন হইয়া, জ্ঞান অর্জ্জন পূর্ব্বক "কার্য্য" করিলে, প্রকৃত অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। উপদেশ না পাইয়া না জানিয়া কোন কার্য্যই কেহ করিতে পারে না। সমস্ত ইতিহাস, ইহার সাক্ষ্য দিতেছে, সমস্ত প্রাণি জগৎ এই মহান্ সত্যের অনুমোদন করিতেছে। সুতরাং সর্ব্বদর্শী ঋষিরাও বারম্বার এই উপদেশ দিয়াছেন "জ্ঞানের জন্য অধ্যয়ন এবং কার্য্যের জন্যই জ্ঞান।" কার্য্য ব্যতিত জ্ঞানার্জ্জনের এবং তন্নিমিত্ত অধ্যয়নের কোন মূল্য আছে বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না। যিনি যতটুকু

কার্য্য করিবেন তিনি ততটুকুই অধ্যয়ন করিবেন, অথবা যিনি যতটুকু অধ্যয়ন করিবেন তিনি সেই টুকুই কার্য্যে পরিণত করিবেন; কারণ, অধ্যয়ন করিয়া যদি কার্য্যে পরিণত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার সেরূপ বৃথা অধ্যয়নে লাভ কি? অতএব বুঝিলাম, সেকেলে মতে, যাঁহার শিল্পকার্য্য, তাঁহার শিল্পকার্য্য অধ্যয়ন আবশ্যক, যাঁহার কৃষিকার্য্য, তাঁহার কৃষিকার্য্য অধ্যয়ন বিধেয়, যাঁহার বাণিজ্য কার্য্য, তাঁহার বাণিজ্য বিষয় জ্ঞানের জন্য অধ্যয়ন বিধেয়, যিনি রাজা, তাঁহার রাজনীতি অধ্যয়ন প্রয়োজন, যিনি গৃহিনী তাঁহার গৃহকার্য্য অধ্যয়ন প্রয়োজন, এইরূপে যাঁহার কার্য্য আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান, তাঁহার আধ্যাত্মিকজ্ঞানের জন্য অধ্যয়ন করাই একান্তকর্ত্তব্য। অবশ্যই, এই অভিনব কালে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে, পাশ্চাত্য সভ্যতালোকে প্রতিফলিত মতানুসারে এ সমস্ত ভাব সম্যক বিষদৃশ বোধ হইতে পারে, কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার ঋষিদিগের দৃষ্টিতে এই-রূপ "কার্য্যানুযায়ি" জ্ঞানচর্চ্চা অতীব অনুষ্ঠেয় ও আত্মার একান্ত কল্যাণপ্রদ বলিয়া, বড়ই সমাদৃত ছিল। তাঁহারা বৃথা অধ্যয়ন এবং উদ্দেশ্য বিহীন কার্য্যকে মূর্খের, বর্ব্বরের, উন্মত্তের, জড়ের, এমন কি, পশুর কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং

যাহাকে ইহজীবনে কখনও রন্ধন কার্য্য করিতে হইবে না, তাহার, বৃথা সময়াতিপাত করিয়া, পরিশ্রম পূর্ব্বক রন্ধন কার্য্য অধ্যয়ন, উন্মত্তের কার্য্য মনে করিতেন। যাহাকে, কস্মিনকালেও, কৃষিকার্য্য করিতে হইবে না, তাঁহার হলচালন-প্রণালী অধ্যয়ন করিবার জন্য সময় নষ্ট করাকে, মূর্খের কার্য্য বলিয়া ভাবিতেন। যিনি, কোন জন্মেও রাজকীয় কার্য্য করিতে পাইবেন না, তাঁহার রাজনীতি চর্চ্চা করাকে, নেহাত বর্ব্বরের কার্য্য বলিয়া, নিতান্ত অপদার্থ দৃষ্টিতে দেখিতেন। এইরূপ শিল্পির বাণিজ্য শিক্ষা, বণিকের শিল্প শিক্ষা, কৃষকের রাজনীতি চর্চ্চা ও অনধিকারীর অধ্যাত্মিক আলোচনা, এ সমস্ত অসভ্যতার ও বালোচিত কার্য্য বলিয়া ভাবিতেন। দ্বিতীয়তঃ, অধ্যয়ন জন্য যে প্রভূত মানসিক পরিশ্রম হয়, তাহাতে, যে পরিমাণ, মস্তিষ্কের ক্ষয় হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য বলক্ষয়, বুদ্ধিক্ষয়, শারীরিক অস্বস্থতা ও তজ্জনিত যে পরিমাণে আয়ুক্ষয় ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে, সে সমস্ত তাঁহারা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেন। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জীবনের বহুমূল্য সময় যে বৃথায় অতিবাহিত হইয়া যায়, সেদিকেও তাঁহাদের দৃষ্টিথাকিত। সুতরাং, একদিকে, উদ্দেশ্যবিহীন অধ্যয়ন, যাহা পরিণামে কোন রূপই সুফল প্রসব করে না, আবার অন্যদিকে, বৃথা অধ্যয়ন জন্য বল, বুদ্ধি, আয়ু

ইত্যাদি সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়, যাহার অভাবে মনুষ্য আপনার মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত হারাইয়া বসে। এই সমস্ত ঘোর অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখিয়াই, পরিণামদর্শী ঋষিগণ যাহার যতটুকু কার্য্য, তাহাকে ততটুকুই অধ্যয়নে অনুমতি দিয়াছেন। যে কার্য্য আমাকে ইহজীবনে কখনই করিতে হইবে না. তাহার জন্য, আমি আমার সমস্ত বল বুদ্ধি আয়ু পর্য্যন্ত ক্ষয় করিয়া, কেন পণ্ডশ্রম করিব। তবে আর উদ্দেশ্য বিহীন কার্য্যকারির সহিত, পশুর ভিন্নত্ব কোথায়? সুতরাং, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ বৃথা অথচ মহান অনিষ্টকর কার্য্যে কেন প্রশ্রয় দিবেন? অতএব, এখন আমরা বুঝিলাম, যে, প্রাচীনকালের অধ্যয়নের উদ্দেশ্য, এবং এখনকার অধ্যয়নের উদ্দেশ্য, সম্পূর্ণ পৃথক। আর, সেই প্রাচিন কালের অধ্যয়ন জিনিষটিও যে, এখনকার অধ্যয়নের তুলনায়, সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই সবিস্তারে বুঝাইয়া আসিয়াছি। এই দুইটি বিষয় পাঠকগণের স্মরণ থাকিলেই, আমরা পূর্ণ ভরসা করি, যে; আমাদের আলোচিত বিষয়, তাঁহাদের বুঝাইতে সক্ষম হইব।

অধিকন্তু এই সঙ্গে আমরা একরূপ এটুকুও বুঝিলাম, যে, মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ, যে, সাধারণকে বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকার দেন নাই তাহা তাঁহাদের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা, সাপেক্ষতা, বা নিষ্ঠুরাদি

দোষ জনিত নহে। ঋষিগণ কদাচ সঙ্কীর্ণ, সাপেক্ষ বা নিষ্ঠুরহৃদয় ছিলেন না, তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন। মনু প্রভৃতি ঋষিগণ, যে, সাধারণকে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে নিষেধ করিয়াছেন, উহা কেবল অনধিকারচর্চ্চা এবং নিরুদ্দেশ্য বলিয়া। কেবল তাহাই নহে, আরও অনেক কথা আছে। প্রথমতঃ, পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঋষিরা আমাদের অপেক্ষা সহস্রগুণে সময়ের মুল্য বুঝিতেন। এইরূপ ফল বিহীন, উদ্দেশ্য বিহীন প্রত্যুত মহাপকার "অধ্যাপনাকার্য্যও" তাঁহারা কদাপি করিতেন না; সুতরাং, সকলে বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে সুবিধা পাইত না। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম সম্বন্ধে, ঐরূপ অধ্যয়নে, নিজের ও সমাজের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়; এবং যে দেশে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সমস্তই ধর্ম্ম রূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, সে দেশে মুল ভিত্তির স্বরূপ ধর্ম্মেরই যদি বিনাশ হয়; তৎসঙ্গে সঙ্গে ধন, মান, সমাজ, স্বাধীনতা প্রভৃতি সমস্তই যে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবে, তাহা বিচিত্র কি? বোধ করি এটী অনেকে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, বলিবেন সেকি! সাধারণে শাস্ত্রালোচনা করিবে, সেত ভাল কথা। তাহাতে সমাজের উপকার ভিন্ন অপকার কিসে হইবে? আমরা বলি সামান্য অপকার নহে,

অতি ভীষণ অপকার সংঘটিত হইয়া থাকে। যে অপকার বীজ, আজ ত্রিংশতি কোটি হিন্দুর সমক্ষে ম্যাক্সমুলার, ও তাঁহার বঙ্গীয় বিষ্যগণ, এবং পাশ্চাত্যালোকিত "অহংতত্বজ্ঞানী" মহোদয়গণ অরাপে, অবলীলাক্রমে বপণ করিয়া, ফল ফুল শোভিত প্রকাণ্ড কাণ্ডে পরিণত করিয়াছেন। এরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়িয়া আর অন্য প্রমাণ কি দেখাইব? ষড়দর্শন ও উপনিষদাদি প্রণেতা মহর্ষিগণ যাঁহাদের পদরেণুর 'সহস্রাংশের একাংশোপযোগী মনুষ্য, এসংসারে দৃষ্টি গোচর হয় না, যাহাদের জ্ঞান গরিমার বিষয় ভাবিয়া কতশত মহান্ পণ্ডিতমণ্ডলি স্তম্ভিত হইয়াছেন ও হইতেছেন, তাঁহারা যে বেদকে মস্তকে ধরিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অবলম্বনীয় শাস্ত্র বলিয়া, কত আনন্দের সহিত গুণানুকীর্ত্তণ করিয়া গিয়াছেন, যে গ্রন্থকে উপনিষদে ঋষিগণ হৃদয় খুলিয়া গাহিয়াছেন,—

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি * *

যাহাকে শঙ্করাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্যদেব বলিয়াছেন,

নহীদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদি লক্ষণস্য সর্ব্বতো গুণান্বিতস্য সর্ব্বজ্ঞাদন্যতঃ সম্ভবোস্তি।

এখন কি না, "সেই মহান হইতেও মহান অমূল্য গ্রন্থ রত্ন, অন্তঃসার বিহীন মহামুর্খের বর্ব্বরের হস্তে

পড়িয়া, লাঞ্ছিত ও পদদলিত হইতেছে, ইহাপেক্ষা অনধিকারীর বেদাধ্যয়নের বিষময় ফল আর কি হইতে পারে? আমাদের বিশ্বাস যে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের এরূপ, অপ্রতিবিধেয় অধঃপতনের প্রধানমত কারণ অনধিকারীর শাস্ত্রচর্চ্চা। এইত গেল সমাজের অনিষ্ট; আবার যিনি ঐরূপ অধ্যয়ন করেন, তাঁহার ব্যক্তিগত অপকারও তদ্রূপ। যেমন, একজন হয়ত আজন্ম ভক্তির অনুরাগী, সূক্ষ্ম বিচারের তিনি বড় অপেক্ষা রাখেন না। তিনি হয়ত, অটল অচল ভাবে পূর্ণ ভক্তি সহকারে, ভাবগ্রাহী ভগবানকে নিজের অভিরুচি অনুসারে ডাকিতে পারিলে, পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারিতেন, কিন্তু যদি, তিনি আপনার প্রকৃত্যনুযায়ী পন্থা অবলম্বন না করিয়া, শাস্ত্রে "অবারিতদ্বার" পাইয়া, নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বকশুষ্ক জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার যে "ইতোনষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ" হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার প্রকৃতি যে পন্থার অনুমোদন করিতেছে, সে পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, বিপরীত পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক নিজ প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিলে তাহাতে, যে কি ফল হইয়া থাকে, তাহা সুবুদ্ধি পাঠকগণকে আর বেশি করিয়া বলিতে হইবে না। এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়াই, ভবিষদ্দর্শী প্রাচিণ ঋষিগণ পরিণামে লক্ষ্য

রাখিয়াই প্রকৃত অধিকারী ব্যতিত অনধিকারীর শাস্ত্র চর্চ্চা নিষেধ করিয়াছেন, অর্থাৎ কেবল একমাত্র "সুব্রাহ্মণকে" শাস্ত্রে পূর্ণাধিকার দিয়াছেন, তদ্ব্যতীত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে কতক অধিকার দিয়াছেন, কিন্তু শূদ্রকে একান্ত অনধিকারী বিবেচনায় একবারেই শাস্ত্র অধ্যয়নে অধিকার দেন নাই। (এখানে এটি জানা উচিৎ যে, শূদ্র কথাটী অনধিকারী কথার অন্যতম একটী সজ্ঞা মাত্র।)

এইরূপে তত্ত্বদর্শীঋষিগণ শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকারীত্ব অনধিকারিত্ব লইয়া নানা প্রকার বিধি ব্যবস্থা করিলেন। এই সমস্ত বিধি ব্যবস্থা সম্প্রাদায় বিশেষের উপর পক্ষপাতি হইয়া প্রনয়ণ করেন নাই, বরং একান্ত দয়াপরবশ হইয়া অশেষ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক জীবগণের প্রকৃত কল্যাণ কামনায় এরূপ করিয়া গিয়াছেন। মূর্খ আমরা, তাহাই না জানিয়া না শুনিয়া না বুঝিয়া ঈশ্বরকল্প ঋষিদের উপর অযথা দোষারোপ করিতে সাহসী হই।

প্রথমে শাস্ত্র অধিকারীত্ব অনধিকারীত্ব বিচার করিতে গিয়া অধিকারীকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন মনুষ্যের আত্মা চারিটি আবরণে আবৃত, এই প্রত্যেক আবরণের নাম একটি একটি কোষ। এইরূপ কোষচতুষ্টয়াচ্ছাদিত নিত্য-বুদ্ধ-মুক্ত,

নিরবয়ব, নির্ব্বিকার চৈতন্যমাত্র আত্মা এই জীবদেহে বিরাজিত থাকেন। মনুষ্য এই আবরণ চতুষ্টয় জন্য আপনার প্রকৃত স্বরূপ সন্দর্শনে বঞ্চিত হইয়া থাকে। প্রকৃত স্বরূপোপলব্ধি করিতে হইলে নানাবিধসুগমোপায় দ্বারা এই আবরণ চতুষ্টয় উন্মোচন করিতে হইবে। অধঃস্রোতস্বিনী বৃত্তি সমূহের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া ঊর্দ্ধ স্রোতস্বিনী বৃত্তি সকলের চর্চ্চার দ্বারা আমাদের যাবতীয় শক্তি আত্মার উন্নতির অনুকূলে ছাড়িয়া দিতে হইবে। কি কি উপায় দ্বারা এই আবরণ চতুষ্টয় হইতে বিনির্মুক্ত হওয়া যায় তাহাই শাস্ত্রে বহুতর পন্থায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এই আবরণোন্মুক্ত হইবার উপায় সংগ্রহের জন্যই বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়নের আবশ্যক।

আত্মা যে চারিটি কোষের* দ্বারা আবৃত তাহার প্রথমটির নাম অন্নময় কোষ, দ্বিতীয়টির নাম মনময় কোষ, তৃতীয়টির নাম বিজ্ঞানময় কোষ, এবং চতুর্থটির নাম আনন্দময় কোষ। আত্মস্থ হইতে হইলে অর্থাৎ প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ক্রমশঃ এই চারিটী আবরণ উন্মুক্ত করিয়া স্বরূপে অবস্থিতি করিতে

---

* কোন কোন গ্রন্থে আর একটি প্রাণময় কোষের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যস্থলে অন্নময় ও প্রাণময় এ উভয়কে এক করিয়া লইয়া চারি কোষ বলিয়াছেন।

হইবে। যিনি যতটুকু আবরণোম্মুক্ত হইতে পারিয়াছেন, তিনি ততটুকু আত্মজ্ঞানী হইতে সক্ষম হইয়াছেন। যিনি কেবল মাত্র অন্নময় কোষে আপনাকে আবদ্ধ ভাবিয়া কার্য্য করেন, অর্থাৎ যিনি আপনার আমিত্বকে এই স্থূল দেহ হইতে উঠাইয়া লইতে পারেন নাই, তিনিই শূদ্র পদবাচ্য; আর যিনি অন্নময় কোষ হইতে নিজের আমিত্ব উঠাইয়া লইয়া মনময় কোষে অবস্থিতি করিতেছেন তিনি বৈশ্যপদবাচ্য; যিনি নিজের আমিত্বকে মনময় কোষ হইতে উঠাইয়া লইয়া বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থিতি করিয়া থাকেন তিনিই ক্ষত্রিয় পদবাচ্য এবং যিনি এই কোষত্রয় অতিক্রম করিয়া কেবল আনন্দময় কোষে বিরাজ করেন তাঁহাকেই শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং যিনি অন্নময় কোষ হইতে আপনার আমিত্ব উঠাইয়া লইয়া মনময় কোষে উপনীত হইতে পারেন নাই তাঁহার মনময় কোষের অনুষ্ঠানাদি জানিবার কোন প্রয়োজন নাই; কারণ, অন্নময় কোষে আত্মা জড়িত থাকায় দেহাভিমান স্বতঃই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। দেহাভিমানীর আত্মজ্ঞান লাভ নিতান্তই অসম্ভব। এইরূপ যিনি মনময় কোষ হইতে আমার আমিত্ব উঠাইয়া বিজ্ঞানময় কোষে উপস্থিত হইতে সক্ষম হন নাই, তাঁহার বিজ্ঞানময় কোষের অনুষ্ঠানাদি জানিবার

কোন প্রয়োজনই নাই, এইরূপেই আনন্দময় কোষ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। অথচ বেদ ও দর্শনাদি শাস্ত্রে আত্মাকে কিরূপে নিম্নতম অন্নময় কোষ হইতে সর্ব্বোচ্চ আনন্দময় কোষে উঠিতে হয় তাহারই উপায় এবং ঐ সকল বিষয়ের চিন্তা এবং অনুভূতি মূলক প্রক্রিয়া এবং অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় মন্ত্র তন্ত্রাদি সকল লিখিত আছে। সুতরাং, যাহার যেটুকু উপকারে আসিবে না, তাহার, সেই সম্বন্ধে লিখিত মন্ত্রাদি পাঠে অথবা, তাহার কোনরূপ অবৈধ অনুষ্ঠানে, ফল দেখা যায় না। বরং অনধিকারীর এই অবৈধ অধ্যয়ন জনিত যে যে বিষময় ফল ঘটিবার সম্ভব, যাহা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, তাহাই ঘটিবে মাত্র। শূদ্র যখন কেবলমাত্র অন্নময় কোষেরই অধিকারী তখন তাহারা যদি কোন উচ্চকোষের বিহিত অনুষ্ঠান করিতে যায়, তাহা হইলে তাহার কোন উপকার না হইয়া, সমুহ ক্ষতি হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। কারণ, আমাদের শাস্ত্রোক্ত আত্মদৃষ্টি লাভের জন্য প্রাণায়ামাদি যে সকল অনুষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা কোনরূপ বাহ্যিক প্রক্রিয়া নহে, উহা বিবিধ দেহাবৃত আত্মাকে বন্ধনোন্মুক্ত করিবার নিমিত্ত দেহাশ্রিত আত্মার বন্ধনোন্মুক্তরূপ উন্নতির অনুকূলে সংস্থাপন করিবার প্রণালী বিশেষ, অর্থাৎ পঞ্চ বায়ু, দ্বাদশেন্দ্রিয়

ও অহঙ্কারাদি যাহা কিছু সমস্তই এরূপ আয়ত্ত করিতে হইবে, যাহাতে সকলেই, আত্মার বন্ধনোন্মুক্ত হইবার পথে, কোন বাধা না জন্মাইয়া বরং সাহায্য করিতে উদ্যোগী হয়। সুতরাং, যদি প্রকৃত অধিকারানুসারে বৈধ অনুষ্ঠান দ্বারা সে পথে অগ্রসর না হওয়া যায় তাহা হইলে দেহের ও মনের নানারূপ বিশৃঙ্খলা হইয়া সর্ব্বনাশ হইবার বিশেষ সম্ভব। সেই জন্যই সর্ব্বদা ঋষিরা অধিকারী নির্ণয় করিয়া যাহার যতটুকু প্রয়োজন তাহাকে ততটুকুই অধ্যয়ন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। এবং পাছে দুর্ব্বল মানব অবৈধ অনুষ্ঠান দ্বারা নিজের সর্ব্বনাশের পথ সহজে উন্মুক্ত করিয়া দেয়, এই জন্য অনধিকার চর্চ্চায় বিশেষ শাস্তির বিধান করিয়া গিয়াছেন। এরূপ প্রকৃত কল্যাণার্থীদেরও যদি আমরা অযথা নিন্দাবাদ ও ভৎসনা করিয়া কৃতঘ্নতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করি, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় নীচ অধম জাতি জগতে বিদ্যমান আছে কিনা সন্দেহ।

অনেকে বলিয়া থাকেন, যে, যদি পূর্ব্বকালীন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্রাদি শূদ্রাদিগকে "অধ্যয়ন" করিতে অনুমতি করিতেন তাহা হইলে শূদ্রেরা এত ধর্ম্মহীন মূর্খ হইত না। কেন না এখন দেখা যায় অতি বর্ব্বর জাতিদিগকে অল্পে অল্পে শিক্ষা

নিদেশ সময়ে তাহারাও জ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। যেমন অধুনা স্লেচ্ছাধিকারে সর্ব্বজাতি নির্ব্বিশেষে সমান শিক্ষা (বিলাতি) দেওয়ায় শূদ্রেরাও বিলাতি শিক্ষায় ব্রাহ্মণের সমকক্ষ এমনকি অনেক স্থলে উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইত্যাদি।

যাঁহারা আমাদের এই মনুসংহিতা শীর্ষক প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আসিতেছেন আমাদের বিশ্বাস তাঁহারা কদাচ এ ভ্রমে পড়িবেন না। কেননা, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে বর্ত্তমানের শিক্ষা অথবা অধ্যয়নের যেরূপ প্রণালী ও উদ্দেশ্য পুরাকালে সেরূপ ছিল না। তখন কেবল আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের জন্যই অধ্যয়নের অথবা শিক্ষাদির প্রথা ছিল। এখন যেরূপ উদ্দেশ্যে শিক্ষা ও অধ্যয়ন প্রচলিত এরূপ উদ্দেশ্যে ও প্রণালীতে আচণ্ডাল সর্ব্বজাতি অনায়াসে বেদ হইতে তন্ত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিতে পারেন। শাস্ত্র তাহাতে কোন আপত্তিই করিবেন না। শাস্ত্র কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতিপ্রার্থীদিগের জন্য এত অধিকারীর বিচার করিয়াছেন। আবার এমনও অনেকে বলেন যে ব্রাহ্মণেরা নিজ প্রভুত্ব হানির ভয়ে ভীষণ কঠোর আজ্ঞায় শূদ্রাদি জাতিদের বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে নিষেধ করিয়াছেন এবং যদি কেহ তাঁহাদের আজ্ঞা অবহেলা করিয়া শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন

করিত, তাহা হইলে তাঁহারা নানাবিধ অত্যাচার দ্বারা উহাদের শাসন করিতেন। কেবল শূদ্রদের ক্রীতদাসের ন্যায় রাখিবার জন্য এবং তাহাদিগকে আপনার কার্য্যে লাগাইয়া স্বার্থসিদ্ধির মানসে এরূপ জঘন্য ব্যবহার করিতেন। যেখানে ক্ষত্রিয় রাজা, বৈশ্য বাণিজ্যশীল ধনী, শূদ্রেরাও যে সাংসারিক সম্বন্ধে অতি অল্প ক্ষমতাবান ছিল, তাহাও বোধ হয় না, কারণ গুহক চণ্ডাল জাতীয় হইয়াও বহুধন-জন-পারিষদে পরিবেষ্টিত ছিল, সেখানে স্বল্প সংখ্যক বনবাসী ফল মূল আহারী দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিসের বলে এত ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে সক্ষম হইতেন, ইহাও এক অদ্ভুত রহস্য বটে। লক্ষ লক্ষ সৈন্যের অধিপতি প্রবল পরাক্রান্ত রাজাগণ ত ইচ্ছা করিলেই এই অত্যাচারী মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণগণকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারিতেন। তখন রাজাগণ বর্ব্বর অথবা গণ্ডমূর্খ ছিলেন না, অধিকাংশ রাজাই বুদ্ধি ও জ্ঞানে সুশোভিত ছিলেন, জনকাদি রাজর্ষিগণ তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ। তবে কেন দরিদ্র ব্রাহ্মণেরা এত আধিপত্য করিত? ঋষিদিগের অলৌকিক তপ প্রভাবই ইহার মুখ্যতম কারণ।

আর ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত যে বেদাদি যাবতীয় শাস্ত্র ব্রাহ্মণদের দ্বারা রচিত। কোন শূদ্রই একদিন ও শাস্ত্র রচনা করেন নাই। ইহা যদি সত্য হয়,

তবে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, যে, প্রথম হইতেই কেবল ব্রাহ্মণেরাই কেন শাস্ত্র লিখিতে সক্ষম হইলেন? কৈ এত অসংখ্য শূদ্রের মধ্যে একজনও একখানি ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়া যান নাই? তাঁহারা কেন তাঁহাদের মনমত শাস্ত্র রচনা করিয়া ব্রাহ্মণদের সেই শাস্ত্রাধ্যয়নে নিষেধ বিধি করিলেন না? সকল জাতি যখন একই ঈশ্বরের সৃষ্ট তখন মনুষ্য মাত্রেরই বুদ্ধি বৃত্তি একরূপ হওয়াত উচিত, কিন্তু তাহা না হইয়া, এরূপ বিভিন্নতা হয় কেন? তবেই স্বীকার করিতে হয় যে ব্রাহ্মণেরা কোন পূর্ব্বার্জ্জিত ক্ষমতা বলে অথবা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহে সাধারণাপেক্ষা বিশেষ বৃত্তি-লাভ করিয়াছিলেন। যদি বলেন ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা আধ্যাত্ম চর্চ্চা করিতেন বলিয়াই এত আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়াছিলেন। শূদ্রেরাও কেন আধ্যাত্ম চর্চ্চা করিতেন না? আধ্যাত্মিক উন্নতি অতি সঙ্গোপনে হৃদয়ের মধ্যে করিতে হয়। ব্রাহ্মণেরা না হয় বাহিরে তাহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে দেখিলে অত্যাচার করিতেন। অন্তরের মধ্যে ত আর তাঁহারা প্রবেশ করিতেন না। অন্তর্জগতে উন্নতির বাধা জন্মাইতে কাহারও সাধ্য নাই। তবে কেন শূদ্রেরা এত হীন হইল?

আর দেখুন ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদিগকে শাস্ত্রাধ্যয়ন

করিতে দিতেন না, বলিয়া অত্যাচারী কি করিয়া হইলেন ? তাঁহাদের যত্নে ও সাধনায় অর্জ্জিত সম্পত্তি তাঁহারা যদি অপাত্রে প্রদান করিতে ইচ্ছুক না হন, অথবা সেই সমস্ত যত্নে অর্জ্জিত সম্পত্তি অন্যায় রূপে অন্য কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে দেখিলে অন্যায় ব্যবহারকারীকে শাসন করিতেন, এই বলিয়া "অনুদার" হইতে পারেন, কিন্তু অত্যাচারী হইলেন কিরূপে ? চোরকে যদি শাসন করা কর্ত্তব্য কার্য্য হয় ব্রাহ্মণের অমূল্য জ্ঞান রত্নের অপহরণ ও অপব্যবহারকারীকে শাসন করাও সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

তৎপর, এখন আমরা দেখিব যে, মন্বাদি শাস্ত্রে ব্রাহ্মণকে, যে পাপের জন্য যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন, শূদ্রাদি জাতিদিগেরও সেই পাপের জন্য সেই একই রূপ দণ্ডবিধান না করিয়া অন্যরূপ অপেক্ষাকৃত অনেক লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন কেন ? যাহা পাপ তাহা সকলের পক্ষে অনিষ্টদায়ক হইবে না কিসে ?

এই প্রশ্নটির মীমাংসা করিতে হইলে শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি জাতি সম্বন্ধে কিরূপ লক্ষণ করিয়াছেন তাহা বিচার করা আবশ্যক। যদিও এ সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বেই আমরা কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, তথাপি আরও বিষয়টী বিশদ ও প্রামাণ্য করিবার

জন্য এখানে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। শাস্ত্র বলেন,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

এখন ভগবান মনুদেব গুণের এইরূপ লক্ষণ করিলেন,—

"সত্ত্বংরজস্তমশ্চৈব ত্রীন্ বিদ্যাদাত্মনো গুণান্।"

মনুসংহিতা।

গীতাতেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাই বলিয়াছেন,—

"সত্ত্বং রজস্তমইতিগুণান্ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহি দেহিনমব্যয়ম্॥

গীতা।

সুতরাং, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের বিভাগ ক্রমেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্ট হইয়াছে। সত্ত্বগুণ হইতে ব্রাহ্মণ, রজগুণ হইতে ক্ষত্রিয়, রজ ও তমের বিমিশ্রণে বৈশ্য এবং তমগুণ হইতে শূদ্রের উদ্ভব ইহাই শাস্ত্রের মত। এখন শাস্ত্র এই তিন গুণের কিরূপ লক্ষণ করিলেন দেখুন,—

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভএব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেবচ॥ গীতা।

তৎপর কথিত গুণত্রয় যুক্ত ব্যক্তিগণের এইরূপ লক্ষণ করিলেন,—

"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যেভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥
মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো র্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপিচৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরত শ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥
পৃথক্ত্বেনতু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানম্ বিদ্ধি রাজসম্॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রীচ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥

গীতা।

অতএব, ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শাস্ত্রে তামস প্রকৃতি শূদ্রের যেরূর লক্ষণ কবিলেন, তাহাতে ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত যে শূদ্রাদি জাতি, তাহাদের স্বতন্ত্র কোন পাপ আছে বলিয়া বোধ হয় না, কারণ উহারাই পাপের মূর্ত্তি। এখন এই চারি জাতির কার্য্য বিচার করিয়া ভাগবতে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবং।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণং॥

শৌর্য্যং বীর্য্যংধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্র লক্ষণং॥
দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তির্ম্মিত্রবর্গপরিপোষণং।
আস্তিক্যমুদ্যমোনিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণং॥
শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞোহ্যস্তেয়ং সত্যংগো বিপ্র রক্ষণং॥
শ্রীমদ্ভাগবৎ।

গীতাতেও ভগবান্ অর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন,—

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥
শৌর্য্যং তেজোধৃতি র্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চ অপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবঞ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্॥
কৃষিগোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্মস্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥

মনুও এই কথাই বলেন,—

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ং॥
প্রজানাম্‌রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বিষয়েষু প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিক্‌পথং কুসীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ॥

একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেবচ বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥

সুতরাং শাস্ত্র ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির যাহা লক্ষণ করিয়াছেন তাহা আমরা পরিষ্কার রূপেই বুঝিলাম। এখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে শাস্ত্র যে সমস্ত বিধি নিষেধ ও শাসনাদি করিয়াছেন তাহা কথিত "চারি লক্ষণাক্রান্ত" জাতির উপরই করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা ঐরূপ গুণযুক্ত তাঁহাদের উপরই মাত্র শাস্ত্রকর্ত্তাদের আদিষ্ট বিধি নিষেধাদি বর্ত্তিবে। যাঁহারা এই চারি লক্ষণের বহির্ভূত ও সমাজ বহির্ভূত তাঁহাদের উপর কোন আদেশ-বিধি নাই।

এখন, মনে করুন শূদ্রদিগকে শাস্ত্রে যেরূপ লক্ষণে ভূষিত করিয়াছেন তাহাতে তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদির অনমুষ্ঠেয় ভীষণ পাপও অতি লঘু পাপ বলিয়া গণ্য হইত। প্রকৃত পক্ষেই পুরাকালে শূদ্রদের মধ্যে সুরাদি নিত্য পানীয় মধ্যে ছিল। ব্যভিচার, সুরাপান, কদাচার, কুৎসিৎ আহার, প্রভৃতি অন্যান্য জাতির অকর্ত্তব্য যাহা তাহা উহাদের নিত্য কর্ত্তব্য মধ্যেই ছিল। বর্ত্তমান সময়েও ঐরূপ এক শ্রেণীর লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এখন মনে করুন যাহারা নিত্য সুরাপায়ী, তাহাদের উপর হঠাৎ একবারেই যদি আইন করা যায়, যে, তাহারা ঐরূপ

দোষে করিলেই একবারে প্রাণবধ করা হইবে, আর সেই আইন যদি কঠিন ভাবে পরিচালন করা যায়, তাহা হইলে, এই অসংখ্য শূদ্রবংশের কয়জন জীবিত থাকিত? প্রায় সমস্ত শূদ্র জাতিকেই আইনের তীব্র শাসনে মানব লীলা সম্বরণ করিতে হইত। কিন্তু ব্রাহ্মণের যাহা লক্ষণ করিলেন তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে ওরূপ দোষ হওয়াই একরূপ অসম্ভব; সুতরাং নিয়মও কিছু কঠোর করিলেন। কারণ, যে সম্প্রদায় আধ্যাত্মিক রাজ্যের উচ্চসোপানে দণ্ডায়মান হইয়াছে সে যদি হঠাৎ ঐরূপ কোন দোষাশ্রিত হয় তাহা হইলে একবারেই তাহার অধঃপতন হইবারই সম্ভব। কিন্তু শূদ্রেরত সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই। কেন না, পাপই উহাদের কার্য্য। সুতরাং তাহাদের আধ্যাত্মিক অধঃপতনের কোন আশঙ্কা নাই! আমাদের শাস্ত্র যাহা কিছু বিধি নিষেধ করিয়াছেন সে সমস্তই অধ্যাত্মার দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া, বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় সাংসারিক ভাবে তাঁহারা কোন শাসনাদি করিয়া যান নাই। সুতরাং যাঁহারা তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে অক্ষম কেবল তাঁহারাই ঋষিদের দোষারোপ করিবেন। কিন্তু অন্তসারবান অধ্যাত্মদর্শীগণ তাঁহাদের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিয়া ঋষিদের চরণে চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন।

উপসংহারে বক্তব্য,—যে শূদ্র মাত্রেই যে ঘোর তামসিক ছিলেন তাহা নহে। শূদ্র মধ্যেও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন শ্রেণীর লোক আছে। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র সকল বর্ণের মধ্যেই ঐ তিন শ্রেণীরই লোক আছে। শাস্ত্র ব্রাহ্মণকে আবার দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শাস্ত্র আরও বলেন যে ঐ তিন গুণের ক্রিয়া অনুসারে মনুষ্য প্রতিক্ষণে কখন ব্রাহ্মণ, কখন ক্ষত্রিয়, কখন বৈশ্য ও কখন শূদ্র হইয়া পড়েন। সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ের মহিমা যাঁহারা অবগত হইতে পারেন, তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্যও অতি সহজ বোদ্ধ ও সুগম হয়। আমাদের, দ্বিতীয় ভাগে সত্ত্ব, রজ ও তমের কার্য্য ও গুণাগুণ অতি বিস্তার মতে আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ।